বিএনপি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া

বিএনপি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি
আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া

প্রথম প্রকাশ
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

প্রচ্ছদ
উত্তম সেন

বর্ণবিন্যাস
আনোয়ার হোসেন
বিবেকানন্দ জয়ধর

সম্পাদনায়
দীপক মুখার্জী

প্রকাশক
শ্রাবণ প্রকাশনী
কক্ষ ২৮ (নিচতলা) ও ১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৮৬৫১১৬০

মূল্য : ১২০ টাকা

ISBN: 984-32-2916-26

উৎসর্গ

সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র ছোবলে যাদের জীবন প্রদীপ অকালে নিভে গেছে এবং যারা প্রিয় মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে দেশান্তরিত হয়েছেন সেই সকল নির্যাতিত—নিগৃহীত মানুষের উদ্দেশে—

লেখকের কথা

এ দেশের আপামর জনগণের অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা ও দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ধর্মের নামে, ইসলামের নামে পাঞ্জাবি শোষকগোষ্ঠী আমাদের দীর্ঘ ২৩ বছর গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। 'আমরা সকলে মুসলমান ভাই ভাই/ তোমরা চাও আমরা খাই' এই স্লোগান দিয়ে বাংলার জনগণকে শোষণের নিগড়ে বন্দি করে রেখেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে, রুখে দাঁড়িয়েছে সকল প্রকার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে। জাতির জনকের আহ্বানে লড়াকু মানুষ একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী সমরনায়ক জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে কেবল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ই হয়নি, এ দেশের মাটি থেকে নির্বাসিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মের লেবাসে শোষণ-নির্যাতন। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার বদলে আমরা এক সর্বনাশা সহমর্মিতার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা তাদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছি অথবা ভুল করেছি। আমাদের এই ভুলের মাশুল চরম মূল্যে শোধ করতে হয়েছে গোটা জাতিকে যখন '৭১-এর পরাজিত ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠী আমাদের হৃৎপিণ্ডের মূলে চরম আঘাত হেনেছে। এর পরই শুরু হয়েছে ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার অশুভ তৎপরতা। শুরু হয়েছিল দেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর কূটকৌশল। সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ নেমে এসেছে জাতীয় জীবনে। আবার মরণ-যন্ত্রণা। আবার দেশান্তরি হবার পালা।

পচাত্তরের পটপরিবর্তনের সুফলভোগীরা মদদ দিয়ে মোটাতাজা করেছে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আল-বদরদের। সর্বশেষ তাদেরকে হাত ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের

রাষ্ট্রক্ষমতায় অভিসিক্ত করেছে। এই অপকর্মটি অতি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন বিএনপি ও তার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জিয়াউর রহমান। আমাদের জাতীয় জীবনের ট্র্যাজেডি এই যে, স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যারা চতুরতার সাথে পুনর্বাসিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, কোনো কোনো মহল তাদেরকে স্বাধীনতার ঘোষক, স্থপতি ও হোতা বলে এক অলীক ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হয়েছে। আমাদের জাতির ইতিহাস থেকে এই মিথ্যাচারের নির্বাসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সত্যের খাতিরেই এই সকল ছদ্মবেশী খলনায়কদের আসল চেহারা জাতির সামনে উন্মোচিত হওয়া দরকার। আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরার পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বীরত্বগাঁথাকে অবিকৃত অবস্থায় তুলে ধরা উচিত। এই বইখানা সেই লক্ষ্যেরই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস।

⌘

সূচি

জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা বদলাতে

আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল দেশবরেণ্য সাংবাদিক মরহুম আবদুল ওয়াহাবের ছাত্র হওয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র ছিলাম তখন তিনি আমাদের পড়াতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল ব্যক্তিগত নোটবুক। তিনি বলতেন যার ব্যক্তিগত নোটবুক নেই- সে আদৌ কোন সাংবাদিক হতে পারে না। ওয়াহাব স্যারকে সম্মান করতাম, শ্রদ্ধা করতাম হৃদয়ের অন্তর থেকে। তিনি ছিলেন আমাদের পিতৃতুল্য। কিন্তু স্যারের আবেগ-আকুল কণ্ঠ-ভেজা এই নির্দেশ আমরা অনেকেই পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি। ৩৪ বছর নিরবিচ্ছিন্ন সাংবাদিকতার জীবন, অথচ কি অবিশ্বাস্য একটি নোট বুক রাখতে পারিনি। তবে হৃদয়ও একটি নোট বুকের মতো। বড় ঘটনা, বড় স্মৃতি, বড় বিস্ময়, হৃদয়ে কেমন করে জানি মোটা হরফে, অনেক সময় নিচে আন্ডারলাইন সহ খোদিত হয়ে যায়, শত চেষ্টা করলেও তা মোছার উপায় নেই, অনেক সময় এই সকল মোটা দাগের স্মৃতি মুছে যাওয়া কিংবা মলিন হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যতই দিন যায় ততই উজ্জ্বলতর হতে থাকে। ততই বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

১৯৭৮ সালের ১২ ডিসেম্বর আমার সাংবাদিকতার জীবনে তেমন একটি অবিস্মরণীয় দিন। ভুলতে না পারা স্মৃতিভেজা মুহূর্ত। যতই সময় প্রলম্বিত হবে এ স্মৃতি ক্রমেই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। চাবুকপেটা করবে।

এই দিন বন্দর নগরীতে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বৃহৎ শিল্প, যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য হিসাবে আমাদের জাতীয় দুঃসময়ের পরীক্ষিত বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেই জিএম প্লান্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য। এমনি এক মহতী অনুষ্ঠান উপলক্ষে এসেও দিনটির শুরু জিয়ার জন্য সুখকর ছিল না। পতেঙ্গা বিমান

বন্দরে জিয়াউর রহমানের সামনেই মারপিটে লিপ্ত হলেন তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী জামালউদ্দীন ও স্পিকার ব্যারিস্টার সুলতানের গ্রুপ। সকল সাজানো গুছানো পরিপাটি অনুষ্ঠান মুহূর্তেই ম্লান হয়ে গেল এই দু'গ্রুপের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার মধ্য দিয়ে।

জিএম প্লান্ট উদ্বোধন করতে গিয়েও অনুষ্ঠানস্থলে জিয়াউর রহমানকে আরেকটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বাংলাদেশে অবস্থানরত সকল দেশের কূটনৈতিক মিশন প্রধানদের। তাই লোভনীয় কুশনের আয়োজন করা হয়েছিল সকল আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য। গোটা সভাস্থল সু-দৃশ্য সোফাসেটে সাজানো। কিন্তু পাশেই সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত স্থানটিতে ছাড়ানো ছিটানো ছিল কিছু ফোল্ডিং চেয়ার। অধিকাংশই ভাঙ্গাচোরা। মনে হয় কর্ণফুলী নদীর তীরে ফুসকা ও চটপটি বিক্রেতাদের নিকট থেকে চেয়ে আনা হয়েছে। বিষয়টি সাংবাদিকদের জন্য এতই অপমানকর ছিল যে শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম বসবো না, দাঁড়িয়েই নোট নেব। অনুষ্ঠানটি পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হল। আমরা সকলে দাঁড়িয়ে নোট নিচ্ছি। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে জিয়াউর রহমান আমাদেরকে লক্ষ করে বললেন, সাংবাদিক ভাইয়েরা আমরা জানি আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রেও গোলাগুলির মধ্যে দায়িত্ব পালনে অভ্যস্থ। আপনাদের প্রতি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তরা যে অশোভন আচরণ দেখিয়েছেন তার একটা বিহিত অবশ্যই করা হবে। এখানে প্রতিটি দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণ উপস্থিত রয়েছেন। দেশের সম্মানের কথা বিবেচনায় রেখে আপনাদেরকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি। আমরা সাথে সাথেই রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ভাঙাচোরা চেয়ারেই বসে পড়লাম।

অনুষ্ঠান শেষ হলে আমরা সকলেই ফিরে আসলাম। তবে বাসস-র প্রতিনিধি হিসাবে আমার সরাসরি অফিসে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। কারণ রাষ্ট্রপতির সকল কার্যক্রমকে বিস্তৃতভাবে বাসসকে কাভার করতে হয়। আমি পিআইডির আঞ্চলিক প্রধান খালেদ বেলাল সাহেবের সাথে তার মাইক্রোবাসে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে চলে আসলাম যেখানে একই সাথে রাষ্ট্রপতি জিয়া ও অন্যান্য ভিআইপিগণ চলে এসেছিলেন। না বললে অন্যায় হবে, খালেদ বেলাল ভাই একজন অতি উঁচু মাত্রার রসিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। পথে আসার সময় আমাকে বলতে ছিলেন, যাহাই চালভাজা তাহাই মুড়ি। যাহাই বাসস তাহাই পিআইডি। আমি যে সংবাদ সংগ্রহ করবো বাসসকে দিতে পারলে আমার আর কোন কাজ থাকে না। আর বাসস যদি নিজেই সেই সংবাদ সংগ্রহ করে তাহলে "পিআইডি উড বিকাম এ রিডানড্যান্ট অর্গানাইজেশন"। আমরা দু'জনে হেসে উঠলাম। এবার তুলনামূলক সিরিয়াস হয়ে বেলাল ভাই বললেন, এখন সর্বস্তরের গণ্যমান্যদের নিয়ে জিয়াউর রহমান সাহেব সার্কেট হাউসে একটি সভা করবেন। আজিজ ভাই, আপনি যদি এই সভা কভার করেন তবে আমার আর কষ্ট করতে হয় না। বিশেষ করে আমার

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়েছে অফিসে। আমি তাকে আশ্বস্থ করে বললাম যে, অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি আমি কাভার করবো এবং প্রয়োজন হলে বেলাল সাহেব আমার কাছ থেকে নোট নিতে পারবেন। (সাংবাদিকরা প্রায়শই এভাবে নোট আদান-প্রদান করে থাকেন)। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের হলরুমে প্রবেশ করতেই দেখলাম সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বললেন, আপনারা রেস্ট নিন আমি একটু ওয়াস করে আসছি। কিছুক্ষণ পরেই তিনি হল রুমে ঢুকে জামাল উদ্দীন ও ব্যারিস্টার সুলতানের দিকে মিলিটারি কায়দায় একটু 'লুক' দিয়ে খুবই রাগত স্বরে বলেন, আপনারা সকলেই ঠিক হয়ে চলবেন, আমি ইনডিসিপ্লিন কখনও বরদাস্ত করি না। প্রয়োজনে ম্যাজর অপারেশন করে ফেলব। গোটা সভাস্থলে নিথর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। ঠিক এই মুহূর্তে একজন বর্ষীয়ান নেতা (মৃত বলে তার নাম বললাম না) নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, স্যার, আমাদের পতাকায় ইসলামী রং নেই, এটা আমাদের ভাল লাগে না। এটা ইসলামী তাহজ্জীব ও তমুদ্দুনের সাথে মিলছে না। (এই ব্যক্তিটিই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেট অধিবেশনে তোলপাড় করেছিল কেন কোরান তেলায়াতের আগে জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়েছে বলে) তার কথার প্রত্যুত্তরে জিয়াউর রহমান বললেন, হবে, হবে সবকিছুই হবে। আগে হিন্দুর লেখা জাতীয় সঙ্গীতটি বদলানো হোক। তারপর জাতীয় পাতাকার কথা ভাববো। তিনি আরও বললেন, জাতীয় সংগীত বদলানো আমার জন্য কোন কষ্টকর ব্যাপার না। বাকশালীরাই সমালোচনা করে আমাদের প্রিয় গান "প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ" –কে সকল মানুষের কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। আমার কাজ শুধুই এখন ঘোষণা দেয়া মাত্র।

ঠিক এই সময় অতি জোরে বাহির থেকে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। সকলেই অবাক। কার এমন ধৃষ্টতা। দরজা খুলতেই হাতে ওয়াকি-টকি নিয়ে একেবারে লম্বা ধরনের একজন ব্যক্তি দ্রুত পদসঞ্চালন পূর্বক সভাকক্ষে প্রবেশ করেই বলতে লাগলেন, স্যার এখানে একজন সাংবাদিক ঢুকে পড়েছে। সকলেই চাওয়াচায়ি করতে ছিল। আমার অবস্থা একেবারেই সাড়ে-বত্রিশ ভাজার মতো। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, স্যার আমাকে পিআইডি থেকে এই সভা কাভার করার জন্য বলা হয়েছে। আমি জাতীয় বার্তা সংস্থা বাসস-র প্রতিনিধি। এ সময় অত্যন্ত সহাস্যে জিয়াউর রহমান সাহেব বললেন, থাকেন, থাকেন, আপনি ভিতরেই থাকেন, আশা করি আপনিও জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত আমাদেরই লোক।

পুনরায় কথা বার্তা শুরুর মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে বললাম, স্যার আমার মনে হয় আমি বাইরে অপেক্ষা করি। সভাশেষে আমাকে যদি কেউ একটু ব্রিফ করেন তবেই হবে। জিয়াউর রহমান সাহেব নিজেই বললেন, যান আপনি দুপুরের খানা খেতে যান। সম্ভবত এই সভাটা অনানুষ্ঠানিক। এটা সম্পর্কে কোন সংবাদ পরিবেশন করতে হবে না।

আমি হাফ ছেড়ে সভাস্থল থেকে বের হয়ে আসলাম বটে তবে হৃদয়ে থেকে যে রক্ত-ক্ষরণ শুরু হয়েছিল জাতীয় সঙ্গীত পরিবর্তনের কথা শুনে সে মর্মযাতনা কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছিল না।

জিয়াউর রহমান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র বলে দাবিদার। তারই 'মহান অবদান'-এর স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধুর সরকার তাকে বীরোত্তম খেতাবে ভূষিত করেন। জীবিতদের জন্য সংরক্ষিত এটাই মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ খেতাব। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল তার সাথে এই 'হিন্দুর লেখা জাতীয় সংগীত' পরিবর্তনের অভিপ্রায় যুক্তিযুক্ত নয়। তাহলে বীর উত্তম জিয়াউর রহমান কি মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনাটি হৃদয়ে ধারণ করতে পারেনি? অবশ্য পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানের কার্যক্রমের আলোকে এই সন্দেহ একবারেই সমুদ্রের কাছে শিশিরের মতো নগণ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই জিয়াউর রহমান একদিন '৭১-এর ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে তার নাগরিকত্ব বাতিল থাকা সত্ত্বেও বিদেশ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলাদেশে তথা বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করেছিলেন। শুধু তাই নয় জিয়াউর রহমান শাহ্ আজিজকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্বের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন। কে এই শাহ আজিজ? তিনি কি সেই ব্যক্তি যিনি মুক্তিযুদ্ধের সেই অগ্নিঝরা দিনে যখন বাংলাদেশের দামাল মুক্তিযোদ্ধারা বাংলার মাটি ও মায়ের সম্ভ্রম বাচাঁতে পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লিপ্ত সেই ক্রান্তিক্ষণে জাতিসংঘে গিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া-টিক্কা খানের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছিলেন ভারতের জারজ সন্তান (Illict Child of India) সেই শাহ্ আজিজকে যদি প্রধানমন্ত্রীর আসনে অভিষিক্ত করে থাকেন জিয়াউর রহমান তা হলে শাহ্ আজিজের ভাষায়ই মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের অবস্থান বা স্টেটাস কি হতে পারে?

জিয়াউর রহমানের অজানা থাকার কথা নয় যে, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী বীর আর পরাজিত-পরাভূত শত্রুরা এক এবং অভিন্ন হতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী বীর আর পরাজিত কাপুরুষ একে অপরের হাত ধরে চলতে পারে না। বীর যদি কাপুরুষের সাথে দোস্তি করে তাহলে তার বীরত্ব থাকে না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত কবিতার পংক্তি 'ইচ্ছে করে পায়ের নিচে আছড়ে ফেলি মাথার মুকুট।' বিরোত্তম জিয়াউর রহমান আপনি কী করলেন? ইচ্ছা করেই বীরোত্তম খেতাবটি পদতলে দলিত মথিত করলেন? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাবলিল কাব্য বাদ দিয়ে আমাদের বরিশালের একটি আঞ্চলিক কথা বলি। বরিশালে বলা হয়, 'হুয়ারের (শুকরের) কপালে হিন্দুর (সিঁদুর) সহ্য হয় না, থাকে না। মান্দারগাছের সাথে ঘষে মুছে ফেলে'। কোন দেশ, জাতি বা প্রতিষ্ঠান কোন কারণে

কাউকে পদক দ্বারা ভূষিত করতে পারে, সম্মানিত করতে পারে। আবার এমন নজির রয়েছে কোন কারণে কাউকে প্রদত্ত খেতাব আবার কেড়েও নেয়া হয়। আমাদের জাতীয় গর্ব যে আমাদেরকে কারও পদক কেড়ে নিতে হয়নি, অনেকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কখনও সখনও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য কিংবা কুক্ষিগত করার জন্য নিজদের বিরল সম্মান-খেতাব প্রমুখ নিজেরাই পায়ের নিচে আছড়ে ফেলে দিয়েছে। জাতিকে কিছুই করতে হয়নি।

গর্ব করে আজকে বলা হয় জিয়াউর রহমান সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন করেছে। এতে কিন্তু কিছুতেই এটা বোঝার অবকাশ নেই যে সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজিত হওয়ার পূর্বে এদেশের কোন মমিন মুসলমানের মুখে বিসমিল্লাহ্ ধ্বনিটি শ্রুত হয়নি। অথবা একথাও মনে করার কারণ নেই যে সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজনের সাথে সাথে এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করা গোটা দেশে ইসলামী সংস্কৃতির এক অনবদ্য ও অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। আমরা ঘর পোড়া গরু, সিদুঁর মেঘ দেখলেই ভয় পাই। আমরা জানি ধর্ম অতি পবিত্র, অতি সুন্দর। ধর্ম মানুষকে সৎ, বিনয়ী, সাহসী ও দেশ প্রেমিক হতে শেখায়; আবার আমরা এটাও দেখেছি ধর্ম যখন রাজনীতির স্বার্থে কিংবা ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে তখন কি প্রকটভাবে ধর্মের অপব্যবহার হয়, ধর্ম কলুষিত হয়। এই ধর্মের নাম দিয়েই পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠী ২৩ বছর বাঙালিদের নির্মম শোষণ-বঞ্চনার শিকারে পরিণত করেছিল। এই ধর্মের নামেই ২৫শে মার্চ নীরিহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী পশু শক্তিরা গণহত্যা চালিয়েছিল, ইসলাম রক্ষার নামেই আমাদের দু'লক্ষ মা-বোনদের রজনীগন্ধার মতো পবিত্রতা তছনছ করা হয়েছিল এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর একই ধর্মব্যবসায়ীরা সংবিধানে বিসমিল্লাহ্ সংযোজনসহ হরেক রকম কাজ করেছিল। এর সাথে পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোন উন্নতি কিংবা অবনতির প্রশ্ন জড়িত ছিল না। শুধুই জড়িত ছিল সুবিধাবাদী ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার কৌশলটি।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে কিছু কথা রয়েছে। এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করতে পারেনি। আবার কেউ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করতে পারেনি বটে তবে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে স্রেফ এক চতুর বাণিজ্যের অভিযাত্রী হয়ে। আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণার দাবিদারদের বেলায়ও একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য।

বিএনপি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

সম্প্রতি গণঅভ্যুত্থানের মুখে পতিত প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ১৬ এপ্রিল মানিক মিয়া এভিনিউর জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'এক শ্রেণীর লোক বাংলাদেশে বাস করে, বাংলাদেশে খায় কিন্তু টাকা জমায় অন্য দেশে। এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। এরা থাকলে দেশের উন্নয়ন হবে না'

বিএনপি নেত্রীর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মেসেজটি একেবারেই পরিষ্কার। খোলামেলা। কোন নাম না বললেও এক শ্রেণীর লোক বলতে তিনি বাংলাদেশের বংশপরম্পরায় নাগরিক হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বুঝিয়েছেন এবং টাকা জমানোর 'অন্য দেশটি' বলতে বুঝিয়েছেন ভারতকে।

বেগম জিয়ার অভিযোগটি কিন্তু খুবই গুরুতর। অন্য দেশে টাকা পাচার করা জঘন্য অপরাধ। কোন কোন দেশের আইন অনুযায়ী টাকা পাচার মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। গণরোষে ক্ষমতাচ্যুতির পূর্বে বেগম জিয়া প্রায় পাঁচ বছর ক্ষমতায় আসীন ছিলেন তাই কারা অর্থ পাচারকারী এ তথ্য নিশ্চয়ই তার জানা। অতএব সবিনয় প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, ম্যাডাম অর্থ পাচারকারী ঐ সব দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকার প্রধান হিসেবে আপনি কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। নাকি টাকা পাচারের ঘটনাটি কেবল আপনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরপরই জানতে পারলেন?

আমরা জানি নির্বাচনের মওসুম আসলেই বিভিন্ন দল হরেক রকমের কূট-কৌশল ও ছলাকলার আশ্রয় নেয়। আবহমানকাল ধরে বাংলার মানুষ চিন্তায়-চেতনায় অসাম্প্রদায়িক। তবুও নির্বাচন আসলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নানা রকমের অপপ্রচারের শিকার হন। কিন্তু খালেদা জিয়া মানিক মিয়া এভিনিউতে যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে শুধু নির্বাচনী ছলচাতুরী বলে চালিয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি কোটি কোটি মানুষের অটল দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাদের চিহ্নিত করার কথা বলে সুখে-শান্তিতে-স্বস্তিতে জীবনযাপন করার মৌলিক অধিকারের ওপর

খবরাদারি করেছেন এবং তারা এদেশে থাকলে দেশের কোন উন্নতি হবে না বলে প্রকারান্তরে তাদেরকে তাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি থেকে দেশান্তরী করার হুমকি দিয়েছেন।

শুধু খালেদা জিয়াই নয় বিএনপি'র নেতৃত্ব থেকে প্রায়শই হিন্দু সম্প্রদায়কে কটাক্ষ করে বক্তব্য দেয়া হয়েছে। এমনকি পার্লামেন্টের পবিত্র ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বিএনপি'র মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা শ্রী সুধাংশু শেখর হালদার, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত প্রমুখ সাংসদকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, 'আপনারা তো ডাবল প্রোটেকশনে আছেন'। বংশপরম্পরায় বাংলার বরেণ্য সন্তান ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কেবলমাত্র হিন্দু হওয়ার কারণে এ জাতীয় জঘন্য মন্তব্যে ও বাক্যবাণের নির্মম শিকার হতে হয়েছে সার্বভৌম জাতীয় সংসদে।

এই সংসদ থেকেই যখন বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যগণ সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি অনুযায়ী হাউস থেকে 'ওয়াকআউট' করে তখন বিএনপি'র নেতৃত্ব থেকে বলা হয়, 'যখন সুধাংশু বাবু আর সুরঞ্জিত বাবুদের ইশারায় সকল সদস্য পার্লামেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে যায় তখন প্রশ্ন জাগে এটা কিসের আলামত।' এটা সকলেরই জানা যে, সংসদ থেকে সদস্যগণ ওয়াক আউট করেন স্ব-স্ব দলের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতার সিদ্ধান্ত অনুসারে। সুধাংশু শেখর হালদার কিংবা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কোন দলের নেতা নন। কেবল সদস্য মাত্র। কিন্তু যত দোষ নন্দ ঘোষ। খোঁচাটা অনেকটা এমনই যে ভারত থেকেই বাবুদের শিখিয়ে দেয়া হয়েছে পার্লামেন্ট বয়কট করার প্ররোচনা দানের জন্য।

এভাবে একটি সম্প্রদায়ের দেশপ্রেমের ওপর নিয়ত নির্মম ছুরি চালিয়ে কিংবা তাদেরকে মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করার মধ্য দিয়ে জাতি হিসেবে আমরা কতটুকু লাভবান হতে পারি? বরং একবিংশ শতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা আজ এ ধ্রুব সত্যটিকে আলিঙ্গন করতে শিখেছি যে, কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন বহুলাংশেই নির্ধারিত হয় সেদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র, গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক চেতনার অধিকারী মানুষদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহ-অবস্থানের ওপর। দেশের সংখ্যালঘু কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মানুষ তখনই তার সহজাত সৃষ্টিশীলতা সমাজের কল্যাণে পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করে যখন তারা তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার বিষয়ে সুনিশ্চিত।

১৯৭১ সালের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহ-অবস্থানের এক অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু '৭৫-এর পট পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উন্মাদনা, মসনদ পাকাপোক্তকরণ ও শাসক গোষ্ঠীর হীন স্বার্থের কারণে সে সুযোগ ধুলোয় মিশে গেছে।

খালেদা জিয়ার কটাক্ষপূর্ণ উক্তির মতোই পাকিস্তানি শাসকদের এককালের বিমাতাসুলভ আচার-আচরণ, কালাকানুন ও হিন্দু উৎখাতের নীল নকশা আজও স্বাধীন বাংলাদেশের

সংখ্যালঘুদের মর্মপীড়ার কারণ। দেশের নাম পাল্টালেও সংখ্যালঘুদের প্রতি শাসকদের চিন্তা-চেতনার তেমন কোন তফাত ঘটেনি, কেবল স্বাধীনতা-উত্তর সাড়ে তিন বছর বাদে।

খালেদা জিয়ার ভাষণে প্রকাশিত ও প্রতিধ্বনিত হিন্দুদের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ, তাদের চিহ্নিতকরণের ও দেশান্তর করার চিন্তাচেতনা সেই পাক শাসকদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই দুই সম্প্রদায়ের শাসকদের হিন্দু বিদ্বেষের কারণটিও একই সূক্ষ্ম সমীকরণের সুতোয় বাঁধা। পাক শাসকদের হিন্দু বিদ্বেষের কারণ তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর প্রশ্নটি। হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খর্ব করা যাবে তাই নানা ফন্দি ফিকির করা হতো হিন্দুদের বিতাড়িত করতে। ঠিক তেমনিভাবে আজকের পাকিস্তানী ঢঙের শাসকরা নির্বাচনের প্রশ্নে হিন্দুদের বৈরী বলে মনে করেন এবং হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই নির্বাচনে কিস্তিমাত করা যাবে- এমন একটি কুটিল মানসিকতা তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ফলে নির্বাচন আসলেই তারা শুরু করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার। এ পর্যন্ত খুব কমই ভোট হয়েছে যেখানে হিন্দু ভোটারগণ নিরুপদ্রবভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। একটি সম্প্রদায় বৈরী পরিবেশে অনন্তকাল কোন স্থানে টিকে থাকতে পারে না। খালেদা জিয়া না চাইতেই বহু পূর্ব থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই এদেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ-এর এক তথ্যে দেখা গেছে, ১৯৬৫ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ৫৩ লাখ হিন্দু নাগরিক এদেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে দেশত্যাগীদের সংখ্যা ৫৩৮ জন।

কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয়টি হলো বিএনপি ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই তার কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনায় দু'টি পরস্পর বৈপরীত্য স্রোতের ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য, সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করার জন্য বিএনপি এক নগ্ন ও সর্বনাশা নতজানু নীতি অবলম্বন করে ভারতকে তোষামোদ ও খোশামোদ করার জন্য বাংলাদেশের বাজার ভারতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। বৈধ ও অবৈধ পথে ভারতের পণ্য দেশে প্রবেশ করতে দিয়ে এদেশের শিল্প ও কৃষিজ পণ্যের উৎকর্ষের সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে, আর যুগপৎ সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য মুখে চালিয়েছে তীব্র ভারত ও হিন্দুবিরোধী বিদ্বেষ, ঘৃণা।

জাতিসংঘের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বেগম জিয়া ফারাক্কা প্রশ্নের গরম বক্তৃতা করে রাতারাতি ভারতবিরোধী হিরোইন হিসেবে নিজেকে দেশের মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অথচ রাষ্ট্রীয় সফরে দিল্লি গিয়ে নরসিমা রাওয়ের সাথে যুক্ত ইশতেহারে দাসখত লিখে দিয়ে ফেরার পথে তিনি বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে

বলেছিলেন, 'সরি, ফারাক্কার ব্যাপারটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম।' আসলে ভুলে তিনি যাননি। ওটা তুললে পাছে নরসিমা রাও অখুশী হন তাই কেবল ভোলার ভান করেছেন ম্যাডাম। শুধু তাই নয় কেবল ভারতীয় প্রতিপক্ষকে খুশি করার জন্যে যুক্ত ইশতেহারে তিনি এমন দাসখত লিখে এসেছেন যার পথ বেয়ে " 'পুশ ইন' 'পুশ-ব্যাক' "অভিযান চালায় দিল্লি সরকার। এখানে উল্লেখ্য যে, খালেদা জিয়া ও নরসিমা রাওয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত যুক্ত ইশতেহারে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, "Both sides agree that there is heavy influx of illegal citizens from the both countries and we agree to take back all such illegal citizens if found in the respective countries." এখানে লক্ষ করার বিষয় যেহেতু খালেদা জিয়া যুক্ত ইশতেহারে কোন সময়সীমা উল্লেখ করেনি অতএব ভারত তার ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী বাংলাদেশ থেকে তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকেও যারা অবৈধভাবে সেদেশে গমন করেছে তাদেরকে স্বাক্ষরিত এই যুক্ত ইশতেহারের বলে বাংলাদেশে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফেরত পাঠাতে পারে। রাষ্ট্রনায়ককে তথা সরকার প্রধানকে শিক্ষিত হতে হয়। শিক্ষাগত সার্টিফিকেট না থাকলেও তাঁকে অর্জন করতে হয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। রাষ্ট্রাচার ও কূটনীতির জটিল কলাকৌশল তাঁর আয়ত্বে থাকতে হয়। তা নাহলে জাতিকে, দেশকে ও দেশের মানুষকে দিতে হয় চরম মূল্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সাথে বাংলাদেশের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে স্বাক্ষর দেন বাংলাদেশের পক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও ভারতের পক্ষে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর তনয়া সমসাময়িক বিশ্বের বিদগ্ধ রাষ্ট্রনায়ক শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। সেই চুক্তির খসড়ায় ভারতের বাঘা বাঘা আমলারা একই কায়দায় এই অবৈধ নাগরিকদের ফেরত নেয়ার বিষয়টি সন্নিবেশীত করেছিল। বঙ্গবন্ধু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হাত ধরে বলেছিলেন, "Madam, don't try to push such a big bundle which my small neck can't bear. I must take back those Bengalies who crossed over to India only after the dreadfull night of March 25, 1971." ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশাল বিশাল কর্তা ব্যক্তিরা বঙ্গবন্ধুর এহেন 'উদ্ধত' ও 'সাহসী' আচরণে স্ত স্তিত হয়েছিলেন। তবে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সহাস্যে বলেছিলেন, "Yes, it will be so." এবং মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিতে এভাবেই বলা হয়েছিল ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে যেসকল নাগরিক ভারতে চলে গেছেন বাংলাদেশ সরকার তাদের ফেরত নেবেন।

খালেদা জিয়া পাঁচ বছর নিরুপদ্রব রাজত্ব করলেন ভারতের সাথে সম্পাদিত ২৫ বছরের 'মৈত্রী চুক্তি'র জোরে আর ক্ষমতাচ্যুতির পরেই হুঙ্কার ছাড়লেন 'গোলামি চুক্তি'র বিরুদ্ধে। সম্প্রতি গণআন্দোলনে ধরাশায়ী হওয়ার পর বিএনপি পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। বেগম জিয়া তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, 'আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে ক্ষমতায় যেতেই হবে। অতএব তাদের ক্ষমতা দখলের মোক্ষম

অস্ত্র ভারত ও হিন্দু বিদ্বেষ প্রচারণার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে একই হারে। তবে সেই মাত্রা বাড়াতে গিয়ে সর্দি-কাশির রোগীকে যক্ষ্মা রোগী বানানোর মতো বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বিএনপি'র নেতৃত্ব।

গত মাসের প্রথম সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিএনপি'র এক সাবেক মন্ত্রী বলেছেন, বিরোধীদলের অসহযোগ আন্দোলন আসলে একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র। তিনি তার বক্তব্যের প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছেন, এই অসহযোগ চলাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকার পণ্য বিভিন্ন ভারতীয় বন্দরে ডাইভার্ট হয়ে গেছে। সত্যিই বটে! বাংলাদেশের মোট বার্ষিক আমদানি পণ্যের পরিমাণ ২১ থেকে ২২ হাজার কোটি টাকা। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ আমদানি হয় ভারত থেকে। বাকি ১৫/১৬ হাজার কোটি টাকার পণ্যের কিছু আসে বিমান কার্গোতে, কিছু চালনা বন্দর দিয়ে, বাকিটা আসে চট্টগ্রাম পোর্ট দিয়ে। কিন্তু বিএনপি নেতার আবিষ্কার অনুযায়ী ২০ দিনের অসহযোগের সময়ই নাকি ৩০ হাজার কোটি টাকার আমদানি পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ভারতীয় বন্দরে চলে গেছে। মন্ত্রী মহোদয় পণ্ডিতই বটে।

বিএনপি'র ধরাশায়ী মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম গত ১০ এপ্রিল যশোরে এক জনসভায় বলেছেন, ২০ দিনের অসহযোগে দেশের ৭৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। (তথ্য-বাসস)। অথচ দেশের মোট জিডিপি'র পরিমাণ মাত্র ১২৫ হাজার কোটি টাকার মতো।

ঘর পুড়িয়ে খই খাওয়া যায় বটে। তবে নেহাত বেকুব ছাড়া কেউ নিজের ঘরে আগুন দেয় না। কারণ আগুনে দু'চারটা খই হয়তো ফুটতে পারে কিন্তু ঘরটাও ছারখার হয়ে যায়। আজ হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশপ্রেমের ওপর কটাক্ষ করে তাদের চিহ্নিত করে কিংবা তাদের দেশান্তর করে নির্বাচন মৌসুমে খই খাওয়ার মজা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু কালে নিজেদের ঘর পুড়বে না এই গ্যারান্টি কে দেবে? দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা, জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের স্বার্থে বাংলাদেশে একটি মালটি-রিলিজিয়াস সমাজের বিকাশ অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে, নির্বাচন জেতার চেয়ে অনেক বড় দেশ ও জাতির স্বার্থ। ছলচাতুরি কিংবা আত্ম-প্রতারণার গিলাব চড়িয়ে কোন জাতিকেই বড় করা যায় না। অতএব যাদের মনে বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম ক্রিয়াশীল তাদের উচিত চাতুরির কাফন দিয়ে যেন আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনাকে ও মননশীলতাকে দাফন করে দেশ ও জাতির সর্বনাশ ডেকে না আনেন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বনাম বিএনপির দেশবিক্রির ধূঁয়া

'গোপন চুক্তির' মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে- বলেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। বরিশালের জনসভায়। ইতিপূর্বে ঢাকায় সাংবাদিকদের ডেকে বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া বলেছেন, "চুক্তি কি হয়েছে জানি না- তবে অসম চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা চুক্তি মানবো না, মানি না।"

চুক্তি কি হয়েছে তা না জানলেও এটি যে অসম চুক্তি তা জানলে কিভাবে হে বাপু। এত সহজ সমীকরণটুকুও ভাবলেন না, এতবড় একটি উক্তি করার আগে! চিলে কান নিয়ে গেছে, অতএব হটাও চিল। গুলিবিদ্ধ করো তাকে। মারো চিল, মারো চিল।

না ম্যাডাম, আপনি একটু হাত দিয়ে পরখ করলেই দেখবেন চিলে আপনার কানও নেয়নি। কানপাশাও নয়। আপনার জ্বলজ্বলে মুক্তোর কানফুল সঠিক স্থানেই রয়েছে। তাহলে আপনি ক্ষেপেছেন কেন? গিরিকুন্তলা পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির ফল্গুধারার প্রবাহ নিশ্চিত হচ্ছে শুনে আপনার অন্তরে অশান্তির আগুন এমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কেন? দীর্ঘ দু'দশক ধরে পাহাড়ী মানুষ শান্তির ললিতবাণী শোনার প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ উদগ্রীব। তাঁদের দ্বার প্রান্তে যখন সুবহ্-সাদেকের উদ্ভাসিত সূর্যকিরণের মত শান্তির সুবর্ণ-রেখা দৃশ্যমান তখন আপনাদের অন্তরের গহীনে রক্তক্ষরণের পালা শুরু হল কেন?

পাকিস্তান আমলে কথায় কথায় বলা হত ইসলাম বিপন্ন। ইসলাম গেল, ইসলাম গেল। আর বর্তমানে একই সুরে পাকিস্তানিদের এদেশীয় চররা কথায় কথায় বলছে দেশ ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। খালেদা জিয়া যেভাবে বলে বেড়াচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হওয়ার কথা এই চুক্তির খসড়া খালেদা জিয়ার কাছে আছে। যদি তাই হয় ম্যাডাম দয়া করে চুক্তিটি প্রকাশ করে জনগণকে বলে দিন চুক্তির কোন

কোন শর্ত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। আর যদি তা না হয় জনগণকে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার অধিকার আপনার নেই। বছরের পর বছর অশান্তির অনলে ধুঁকে ধুঁকে জ্বলছে পার্বত্য জনপথ। পাহাড়ি এই নির্দোষ জনগোষ্ঠি পাহাড়ি ফুলের মতোই নিষ্পাপ। পাহাড়ী ফুল ছুঁতে নেই। পাপড়ী ঝরে পড়ে। তবুও এমনটি হয়েছে। কারণ শুভবুদ্ধি ছিল নির্বাসনে। হিংস্র থাবার নীচে অসহায় হয়ে পড়েছিল মানব সভ্যতা। জাতির চলমান ইতিহাসের কাঁটা থমকে দাঁড়িয়েছিল গহীন পার্বত্য ভূমিতে। পাহাড়ি ঝর্ণার মুক্তোর মতো স্ফটিক জলস্রোতের সাথে নেমে এসেছে নিষ্পাপ মানুষের বুকের চাপচাপ রক্ত। নিজ ভূমে একে অপরের কাছে চিহ্নিত হয়েছে শত্রু বলে। মাতৃভূমির সোদা গন্ধ ভরা মাটির মায়া কাটিয়ে অসংখ্য মানুষ বাধ্য হয়েছে পরদেশে আশ্রয় শিবিরে কাটিয়ে দিতো, অনেক অনেক বসন্ত-বর্ষা এখানে তাদের কেটেছে বিদেশের মাটিতে।

এই সর্বনাশা, অশুভ ও অনাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতৃঘাতী-সংঘর্ষ প্রায় বিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছিল প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বিভ্রান্তির চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে আমরা নিজ নিজ ছায়াকে শত্রু মনে করে এক সর্বনাশা আত্মঘাতী মানবযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম।

অথচ হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, ছলচাতুরী ও গণতন্ত্রের আলখেল্লা পড়ে স্রেফ ভোট ডাকাতির মাধ্যমে একুশ বছর ধরে যে সকল গোষ্ঠী রাষ্ট্র ক্ষমতা জবরদখল করে নিয়েছিল তারা এই ভয়াবহ জাতীয় সমস্যাটির সমাধানে উদ্যোগী হননি। কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এই সমস্যার অন্তর্নিহীত ম্যাসেজটি তারা বুঝতেও পারেননি। অথবা বোঝেও না বোঝার ভান করেছেন।

উপরন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে সমস্যাটি আরও জটিল ও দীর্ঘ করার চেষ্টা করেছে মসনদকে পাকাপোক্ত করতে। ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি-উপজাতীয় মানুষের জীবনকে কখনও নিলাম তুলে দিয়ে, কখনও যুপকাষ্ঠে বলি দিয়ে তারা চেয়েছিল নিজেদের ক্ষমতার ভীত্ মজবুত করতে। মসনদ নিষ্কণ্টক করতে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইস্যুর উপর বিএনপি বর্তমানে যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করছে তা থেকে আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে কেন তারা ব্যর্থ হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠায়। তাদের নেতা কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ বীরবিক্রমকে প্রধান করে যে কমিটি তারা বানিয়েছিল তা নিছক লোক দেখানো। স্রেফ ধাপ্পা। সরল মানুষদের সাথে আত্মপ্রতারণা ও ছলচাতুরী করাই ছিল অলি কমিটির প্রধান মিশন। তাই তারা টেবিলে আলোচনার প্রহসন করলেও নিষ্পাপ মানুষের গাঢ় লাল রক্ত স্রোতে মিশে গেছে শান্তির সম্ভাবনা। বিএনপি তাদের স্বভাব সুলভ চাতুরীর গিলাব পরিয়ে প্রতারণার কাফন দিয়ে দাফন করেছিল শান্তির সম্ভাবনাকে। ঘর পুড়ে খই খাবার মতো একটি আত্মঘাতী পথ বেছে নিয়েছে বিএনপি।

তাই এবার কোমরে আঁচল বেঁধে নেমেছে বিএনপি। শান্তি চুক্তিকে ঠেকাতে হবে। শান্তি চাই না- চাই যুদ্ধ হানাহানী। চাই সংঘাত সংঘর্ষ। কি ভয়াবহ আকাঙ্ক্ষায় পেয়ে বসেছে বিএনপি নেতা-নেত্রীদের।

বিএনপি'র চেয়ার পারসন বেগম খালেদা ঘোষণা করেছেন বরিশালের জনসভায়, 'গোপন চুক্তি'র মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে। বিএনপি কোন এজিপেজি দল নয়। খোদ প্রধান বিরোধীদল। সেদিনও তারা ছিলেন সরকারি দল। অতএব বিএনপি যা বলবেন তা খাটো করে দেখার উপায় নেই। গুরুতরভাবেই মনে করতে হবে বিএনপির কথাবার্তা। তাই বিএনপি যখন বলবে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন তখন অবশ্যই জাতিকে তা গুরুত্বের সাথে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে। এমনকি এই বিপন্ন স্বাধীনতা ও সার্বোভৌমত্ব রক্ষার জন্য কাতারবন্দী হয়ে লাইনে দাঁড়াতে হবে মৃত্যুপণ করে। কিন্তু না বিএনপির কথায় জাতির মধ্যে তেমন কোন একটি গুরুত্বের ভাব দেখা গেল না। যেমনটি একদা খালেদা জিয়াদের পূর্বসূরি পাক-প্রভুরা বলতেন ইসলাম বিপন্ন এবং যে বক্তব্য এদেশের মানুষ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করতেন। আবারও সেই পুরাতন ধুয়া; একই সঙ্গীত। একই অসহনীয় কোরাস গাওয়ার আসর।

ইতিপূর্বে কমনওয়েলথ শীর্ষ বৈঠকের সময় ঢাকা থেকে রিপোর্ট গেছে এডিনবরায় পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির ফলে ফেনী পর্যন্ত চলে যাবে ভারতে - বলেছেন খালেদা জিয়া। প্রেস কাটিং দেখে একজন সিনিয়র সাংবাদিক মন্তব্য করলেন - সর্বনাশ হল বেশী খালেদারই। বেগম জিয়া আর পারবেন না জাতীয় সংসদে যোগ দিতে। কারণ তিনিতো তাঁর ফেনীর আসনটিই রেখে দিয়েছেন। তাই ফেনী পর্যন্ত ভারতে চলে গেলে খালেদাকে হয় বসতে হবে লোকসভায় নতুবা যোগ দিতে হবে বিধান সভায়। আর হয়তো এজন্যই খালেদা জিয়া উঠে পড়ে লেগেছেন শান্তি প্রক্রিয়ার বিপক্ষে। তাই স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে প্রধান বিরোধী দলের পক্ষ থেকে খোদ খালেদা বললেও মানুষ তেমন আমল দিচ্ছে না। দীর্ঘদিন এহেন মিথ্যাচার, ভোজভাজী, জালিয়াতি ও এ ধরনের পাগলের প্রলাপ শুনতে শুনতে মানুষ এখন অভ্যস্থ হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগে ভোট দিলে মসজিদে আর আজান শোনা যাবে না, ভেসে আসবে উলুধ্বনি একথা দৃঢ়তার সাথে খালেদা জিয়া প্রচার করে বেড়ালেও কঠিন বাস্তবে এসে প্রমাণিত হয়েছে কথাটি ডাহা মিথ্যা। মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে তবে মসজিদে আজান কিংবা নামাজ কোনটিই বন্ধ হয়নি। মসজিদ থেকে উলুধ্বনি ভেসে আসছে না। বরং ইথার তরঙ্গে নিশুতি রাতের অন্ধকার ভেদ করে সুবহে সাদেকে ভেসে আসছে "আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম"।

গত ২১ বছর ধরে এই অপশক্তি কেবলমাত্র স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা ও

মুক্তিযুদ্ধের মহানায়কদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে ক্ষান্ত হয়নি। বঙ্গবন্ধু একটি গোপন চুক্তি করে বাংলাদেশকে ভারতের গোলামে পরিণত করে গেছেন বলে জঘন্য প্রচারণা চালিয়েছেন। তবে বিবেকবান দেশপ্রেমিক মানুষেরা যখন প্রশ্ন করেছেন, বঙ্গবন্ধুকে তো তোমরা হত্যা করেছ। সেই গোপন চুক্তিটি এখন তোমরা কোথায় রাখলে। ২১ বছর তোমরা ক্ষমতায় ছিলে। কবে কখন ও কিভাবে তোমরা সেই গোপন চুক্তি বাতিল করে দিয়ে বাংলাদেশকে তাঁবেদার রাষ্ট্র হতে স্বাধীনতা স্বার্বভৌম বাংলাদেশে রূপান্তরে করলে? এর উত্তর তোমরা কখনই জাতির কাছে দিতে পারনি।

বেগম জিয়া আবার নতুন করে 'গোপন চুক্তি'র ধূয়া তুলেছেন। একই নাচন, কেবল ঢং আলাদা। নূতন বোতলে পুরনো মদ। বেগম জিয়া, আপনি মনে রাখলে আপনার ও জাতির জন্য মঙ্গলময় এই যে বর্তমান সরকার শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবেন। অবশ্যই এবং অচিরেই করবেন। তবে কোন গোপন চুক্তি নয়। চুক্তি হবে প্রকাশ্যেই, ঢাক ঢোল পিটিয়ে উৎসব-আনন্দের বন্যায় গোটা জাতিকে উদ্বেলিত করে দিয়ে।

আওয়ামী লীগ কোন গোপন দল না, গোপন কাজ কামে এই দল অভ্যস্ত নয়। এটা তাদের নীতিও নয়, পছন্দের কাজও নয়। আওয়ামী লীগের কর্ণধার বঙ্গবন্ধু এমনকি স্বাধীনতার ঘোষণাও গোপনে দেননি। দিয়েছেন শ্বেতশুভ্র পায়জামা-পাঞ্জাবী ও জমকালো মুজিব কোট পড়ে, ঈষদ হলুদ ঘিয়ে রঙের চাদর জড়িয়ে বিপুল শক্তি ভরা হাতের শাহাদাৎ আঙুল উচিয়ে অজুত লক্ষ কোটি মানুষের মহাসমুদ্রে দাঁড়িয়ে শ্লোগানমুখর জনতার সামনে, "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম" বলে। স্বাধীনতা লাভের পরই জাতির জনক ভারতের সাথে ২৫ বছর মেয়াদী শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। গোপনে নয়- প্রকাশ্যে। আবার একুশ বছর পরে শেখ মুজিবের প্রিয় কন্যা শেখ হাসিনা যখন জনগণের ভালবাসায় সিক্ত হয়ে দেশ সেবার সুযোগ পেলেন বীরদর্পে ভারতের সাথে স্বাক্ষর করে আসলেন ৩০ বছর মেয়াদী গঙ্গা পানি চুক্তি। সারাবিশ্ব কাঁপালেন চুক্তি করে প্রমাণ করে দিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আলোচনার মাধ্যমেই যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব। কেবলমাত্র খালেদা জিয়া ও বিএনপি ছাড়া সারাপৃথিবী এইপানি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। প্রশংসা করেছেন শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে। এই পানি চুক্তিও গোপনে স্বাক্ষরিত হয়নি কিংবা চুক্তির কোন শর্তও গোপন করা হয়নি। কেননা জাতীয় সংসদে ঐ চুক্তিটি হুবহু প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ। প্রতিটি অনুচ্ছেদ, প্রতিটি প্যারাগ্রাফ, প্রতিটি লাইন, শব্দ, দাড়ি-কমা, সেমিকোলন সবকিছুই প্রকাশ করা হয়েছে। কিছুই গোপন রাখেননি।

আসলে গোপন কায়-কারবারে অভ্যস্থ নয় আওয়ামী লীগ। এ ব্যাপারে পটুয়া হলেন বিএনপির জন্মদাতা জিয়াউর রহমান। কিভাবে গোপন-অতি গোপনে রাজাকে মেরে

রাজ্য জয় করা যায়, গোপনে সহ-যোদ্ধা ও সহ-পেশার বন্ধুদের কিভাবে ফাঁসিতে লটকিয়ে নিজের গদি পাকা পোক্ত করা যায়, কিভাবে গোপনে বসে দল বানানো যায়-কিভাবে অন্যের দল ভাঙানো যায় এসব ব্যাপারে বিশ্বকর্মা হলেন বিএনপির নেতৃত্ব। যাদের দলের জন্ম গোপনে, যাদের দলনেত্রীর জন্ম তারিখেও গোপনীয়তায় ভরা, তারা অন্যের সকল কাজের মধ্যে 'গোপন' 'গোপন' গন্ধ পাবে এটাইতো স্বাভাবিক। তবে তাদের একথা বোঝা উচিত যে জাতির কাছে তাদের কোন গোপন কাজই গোপনে থাকে না। এমনকি একাত্তরের অগ্নিঝড়া দশমাস জাতি যখন স্বাধীনতার লড়াইয়ে মত্ত তখন বর্তমান বিএনপি নেত্রী গোপনে দশ মাস কোথায় কিভাবে কাদেরকে নিয়ে কাটিয়েছেন দেশের মানুষ তাও জেনে ফেলেছেন। জাতির কাছে সে গোপন কেচ্ছা 'ওপেন সিক্রেট'। এমনকি সম্প্রতি জাতি যখন স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে নতুন করে দেশ গড়ার শপথ নিয়ে আগুয়ান তখনও বেগম জিয়া গোপনে পাকিস্তানে বসে পুরাতন বন্ধুদের সাথে কি গোপন শলাপরামর্শ করেছেন সেটি তাঁর দেশে ফেরার আগে 'সিসেম ফাঁক' হয়ে গেছে। বেগম জিয়া দেশে ফেরার আগেই মানুষ তার বুকের ভিতরের গোপন কাহিনী পত্রিকার মাধ্যমে জেনে ফেলেছেন।

আওয়ামী লীগ-যার জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে, যাঁর নেতা প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে লাথি মেরে জনগণের অধিকার শ্রেয় বলে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি জীবনের গোটা যৌবন কারাগারে কাটিয়েছিলেন মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে, যিনি হাজার মাইল দূরে জেল প্রকোষ্ঠে বসেও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই আওয়ামী লীগ দেশকে বিক্রি করবে ভারতের কাছে- আর দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে খালেদা জিয়া ও তার লক্ষ সাথী পাক সেনাদের মুরগি সরবরাহদাতা, রাজাকার পদধারী কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সফল ব্যবসায়ী ও সামান্য লোভের বশবর্তী হয়ে বাংলার মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানীর পার্টির সাইনবোর্ড বিক্রি করে স্বৈরতন্ত্রের পদলেহী কুলাঙ্গারবৃন্দ! মায়ের চেয়ে যেন মাসির দরদ বেশী। আসলে মাসী নয় এরা ডাইনী। দেশ ও জাতির ঘাড়ে সত্যিই আজ ডাইনী সওয়ার হয়েছে। সর্বশেষ খালেদা জিয়া চাঁটগাতে ঘোষণা করেছেন; যেদিন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হবে সেদিনই দেশব্যাপি হরতাল ডাকা হবে। কি সাংঘাতিক দেশপ্রেম বিবর্জিত ঘোষণা। উক্তিটি যদি এমন হতো, শান্তি চুক্তির কোন ধারায় যদি দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কিছু সন্নিবেশিত করা হয়, তাহলে আমরা মানবো না এবং হরতাল করবো, তাহলেও মেনে নেয়া যেত।

আজ বিশ্বজুড়ে মানুষ যেখানে কেবল মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে বিভেদের দেয়াল উপড়ে ফেলছে, দেশের সীমান্ত তুলে দিচ্ছে আর দেশের মুদ্রাও করে ফেলেছে

এক ও অভিন্ন এমনি একটি মানব জাতির ঐক্যবদ্ধ মহা মিছিলের মহেন্দ্রক্ষণে কোন এক দেশের কোন এক দলের নেত্রী ঘোষণা দেবে, শান্তি চুক্তি মানি না-যুদ্ধ অশান্তি টিকিয়ে রাখতে হবে। সংঘর্ষ সংঘাত চলবে। তখন এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সরকারের সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে-বাঙালিদের পাহাড় থেকে বহিষ্কার করা হবে এ ধরনের মিথ্যা, অলীক ও প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যাচার ছড়িয়ে জাতিকে হয়তো বিস্মিত করা যাবে কিন্তু কিছুতেই তাদের বিভ্রান্ত করা যাবে না। কারণ জাতি অনেক মিথ্যাচার মোকাবেলা করে '৯৭-এর শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ তাই প্রকাশ্যেই বোঝা যাচ্ছে জাতির ঘরে ডাইনী ভর করেছে। ছোটবেলায় দেখেছি কারো কাঁধে ডাইনী কিংবা ভূত-প্রেত ভর করলে তান্ত্রিক ডাকা হত ডাইনী ছাড়ানোর জন্য। সেই তন্ত্রী-যন্ত্রীরা এসে প্রথমেই লাইট নিভিয়ে অন্ধকার করে দিত বৈঠক জায়গাটি। তারপরে ধুপ-ধূনা দিয়ে শুরু হত বেদম পিটুনি। ঘরের আঙিনা ও পরিষ্কার করার ঝাড়ুটি দিতে হত তান্ত্রীক সাধু বাবাকে। যতবড় ঝাড়ু, যত বেশি পেটানো তত তাড়াতাড়ি হ'তো ডাইনী বিদায়। আজ জাতির ঘরে যে ডাইনী ভর করেছে তা থেকে জাতিকে পরিত্রাণ দিতে হলে সেই ঝাড়ু পেটানো শুরু করা দরকার। এটা যত দ্রুত করা যাবে জাতির জন্য ততই মঙ্গলময় হবে।

খালেদা জিয়ার লং মার্চ : শান্তি নিয়ে অশান্তি

নয় জুনের লং মার্চ নিয়ে দেশে আবার সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপি চেষ্টা করছে তাদের বহু কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় ইস্যু সৃষ্টির জন্য লংমার্চকে ব্যবহার করতে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় ও সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ঐ দিন রাজপথ দখলের কথা ঘোষণা করেছে। অবস্থা যাই হোক একটি প্রচণ্ড ঝড়ের আশংকায় দেশের মানুষ উৎকণ্ঠিত। কখন কার লাশ পড়বে, কার মার কোল খালি হবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সেদিকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না- তাদের কেবল চাই ইস্যু, লাশ এবং লাশের মিছিলে ভর করে ক্ষমতার মসনদ দখল।

আসলে জুনের লং মার্চ কি এবং কেন? এটা কি দেশ ও জাতির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। দুই দশকের বেশি সময় ধরে পার্বত্যগিরি প্রস্তরে যে অশান্তির আগুন জ্বলছিল তা যখন স্তিমিত হয়ে শান্তির সুবর্ণ রেখা উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল তখন গোটা দেশ জুড়ে অশান্তির আগুন জ্বালানোর এই সর্বনাশা আত্মহননের পথ বিএনপি বেছে নিল কেন? পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য বিলসমূহের বিরুদ্ধে বিএনপির কি সত্যিই বিশেষ কিছু বলার ছিল?

আমরা সকলেই জানি পাহাড়ি জংলী ফুল। ওদের সৌন্দর্য অবলোকন করতে হবে অনেক দূর থেকে। ওদের গায়ের সুঘ্রাণে পেতে হবে মৃদুমন্দ সমীরণ স্পর্শ করে। ওদের ছুঁতে নেই- পাপড়ি ঝরে যাবে।

আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক অহংকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার নিষ্কলুষ জনপদের কথা বলতে গেলে উপরোক্ত ঐতিহাসিক উপলব্ধিটুকু মনে রেখেই এগুতে হবে। অন্যথায় সবকিছু ভুল হয়ে যাবে। ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও আইন বাতিলের দাবিতে

নয় জুন লং মার্চ ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান থেকে। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে তিনি তাকাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার যখন পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করে তখন থেকেই বিএনপি তার ঘোর বিরোধিতা করে আসছে। দেশ বিক্রি, ফেনী পর্যন্ত ভারতের অধিকারে চলে যাওয়া, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন কিংবা সংবিধানের লঙ্ঘন প্রভৃতি যে সকল গুরুতর অভিযোগ বিএনপি এ পর্যন্ত জাতির নিকট উত্থাপিত করেছে তার সকল রহস্য ও অন্ত র্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে বিএনপির সংসদ বর্জন, পল্টনে অনশন এবং সর্বোপরি লংমার্চের কর্মসূচির ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে কেবল আওয়ামী লীগই উদ্যোগ নিয়েছে এমনটিতো নয়। বরং বিগত বিএনপি সরকার যেখানে এসে থেমেছে আওয়ামী লীগ সরকার শুরু করেছে সেখান থেকেই। কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ বীর বিক্রমের নেতৃত্বে বিএনপি একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। আওয়ামী লীগের দুজন সাংসদও ছিলেন সে কমিটির সদস্য। তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন অলি কমিটির সাথে। তারা কষ্ট করে অলি কমিটির ৭টি সভায় যোগদিতে গিয়েছেন সীমান্তের অপর পারে- ত্রিপুরায়।

মূলত দুটি প্রধান কারণে অলি কমিটি ব্যর্থ হয়েছেন চুক্তিতে পৌঁছাতে। এক. বিএনপির প্রতি পার্বত্য জনগণের অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা। দুই. সমস্যা সমাধানে বিএনপির ভুল কৌশল। বিএনপি'র প্রতি পার্বত্য জনগণের অবিশ্বাস ও অনাস্থা একবারেই স্বাভাবিক ও সঠিক। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা লোকায়ত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এক নীতি নির্ধারণী সভায় স্পষ্টতই ঘোষণা দিয়েছিলেন "The only solution of Chittagong Hill Tracts problem is to bring a drastic change in the composition of the population of the hill areas" জেনারেল জিয়ার একথা শুধু ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ঘোষণার বাস্তবায়ন এর ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার পাহাড়ি নির্দোষ মানুষকে আবহমানকালের প্রিয় বাস্তভিটা ত্যাগ করে দেশান্তর হতে হয়েছে। হিংস্র অরণ্যানী ও শাপদসংকুল পাহাড়ে বসবাসকারী প্রকৃতির মতোই নির্মল, নির্লোভ ও নির্দোষ বলেই পাহাড়ি মানুষগুলোকে এহেন বিড়ম্বিত ভাগ্য মেনে নিতে হয়েছিল। পাহাড়ি মানুষের স্মৃতিতে যতদিন সেই বিভৎস দৃশ্য সজীব থাকবে, জীবন্ত থাকবে বিএনপির প্রতি তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস ততো দিন দূর হবে না।

দ্বিতীয়ত অলি কমিটি তথা বিএনপির কৌশলটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল। বিএনপির বিশ্বাস পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান করতে হবে Language of weapeans দ্বারা। অবশ্য অস্ত্রের ভাষা বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে পারে। বিএনপির জন্মবৃত্তান্তই এই সত্যকে প্রমাণ করে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে অস্ত্রের

ভাষা নয়। সমাধান Sweet Words-এর মধ্যে নিহিত। এই সত্যটি উপলব্ধি করতে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে বিধায় সমস্যা থেকে গেছে। সমাধান হয়নি। অলি কমিটিতে আওয়ামী লীগের দুজন সাংসদ ছিলেন সদস্য হিসাবে। তাঁরা প্রতিটি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দল সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করার পরও আওয়ামী লীগ সাংসদগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক অলি কমিটির সভায় যোগ দিয়েছেন এবং সভাগুলোতে সবসময়ই শেখ হাসিনার বিঘোষিত নীতি "পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবেই এর সমাধান হতে হবে" এই বক্তব্যটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। এর ফলে জনসংহতি নেতৃবৃন্দ তথা পার্বত্যবাসীদের মনে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে একটি পজিটিভ ধারণা তথা বিশ্বাস জন্মিয়েছে। অপরদিকে সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করায় অলি কমিটির সকল কার্যক্রম সম্পর্কে আওয়ামী লীগ পূর্ণ ওয়াকেবহাল হয়েছে এবং চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় তথা পার্বত্যবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্বচ্ছ হতে পেরেছে। এ সকল কারণেই আওয়ামী লীগের পক্ষে অতি দ্রুত সমস্যা সমাধান এবং মন্দির-মঞ্জিলে পৌঁছা সম্ভব হয়েছে।

অথচ বিএনপি দেখেও শিখতে পারলো না। কেবল ভুলের জগতেই রয়ে গেল। আওয়ামী লীগ চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করেছিল সেই কমিটিতে বিএনপি'র দুজন সাংসদ সদস্য ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তারা একটি সভাতেও উপস্থিত হওয়ার মতো সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে কমিটিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা না জেনেই বিএনপি শূন্যে গুলি ছোড়া শুরু করেছে। জাতির কাছে তাদের আসল অভিলাষ কিন্তু গোপন থাকেনি। বিরোধী দল হিসাবে সমালোচনা বিরোধিতা তারা করবেনই। কিন্তু শত্রুতা করার অধিকার তারা পেলেন কোথায়? বিএনপি এযাবৎ কত অভিযোগ এনেছে পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে সেই সকল অভিযোগসমূহ প্রমাণ করা তথা জাতির কাছে তুলে ধরার মহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল বিএনপির সামনে। মহান জাতীয় সংসদে পার্বত্য বিলসমূহ উত্থাপিত হলে জাতি আশা করেছিল বিএনপি তাদের দাবির সমর্থনে বিলের দফাওয়ারী ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে আওয়ামী লীগ সরকারকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে-আওয়ামী লীগ সরকারকে ফাঁসিতে লটকানোর পাকা ব্যবস্থা বিএনপি করে ছাড়বে।

কিন্তু বিএনপির পলিসি মেকারগণ চরম হঠকারিতার আশ্রয় নিলেন। লণ্ডনের হোটেলগুলোকে কানা করে যে সকল ব্যারিস্টারগণ এসে ম্যাডাম জিয়ার পরামর্শদাতা সেজেছিলেন তারা মনে করেছেন তাদের ওকালতি চাল জনগণ ধরতে পারবে না। প্রায় পাঁচ হাজারের মতো সংশোধনী এনেছে বিলের উপর। বিশ্বের নজিরবিহীন ঘটনা এবং বিরোধী দলের নেত্রী দাবি করলেন সকল সংশোধনীর উপর প্রত্যেককে বলতে দিতে

হবে। মাননীয় স্পিকার বললেন, তাতে করে বিলগুলো নিষ্পত্তি করতে তিন বছর আট মাস সময় লাগবে। খালেদা জিয়া বললেন, আমরা তাতেই রাজি। অবশ্য সরকারের পক্ষে এতে রাজি হওয়ার কোন কারণ ছিল না। রুলস্ অব বিজনেস-এর পরিষ্কার ধারা উল্লেখ করে এবং এই একই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিলের সংশোধনীর সময় বিএনপি স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপকে প্রিসিডেন্স হিসাবে গ্রহণ করে স্পিকার যে সিদ্ধান্ত দিলেন তাতে এই বিএনপি দলীয় ২৭ জন এমপিকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তদুপরি বিরোধীদলের নেত্রীর জন্য বরাদ্দ করা হল তাঁর ইচ্ছা মাফিক অফুরন্ত সময়। কিন্তু সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারলো না বিএনপি। বোষ্ঠমী তোমার গায়ে গেরুয়া বসন কিন্তু ঝোলার মধ্যে তো গোমাংস লুকানো। বিএনপি আসলে চাইছে সংসদ থেকে বের হয়ে আসতে। কারণ আদতে হিসাব-নিকাশ করে দেখেছেন বিলের বিরুদ্ধে তাদের বলার কিছুই নেই। দাড়ি-কমা-সেমিকোলন কিংবা কোথাওবা 'ব'-এর স্থলে 'র' ইত্যাদি চুনকাম করা ছাড়া আর কোন মেজর রিকন্সট্রাকশন করার মতো একটি বাক্যও নেই বিলে। অতএব পল্টনে যাওয়াই বেহেতর। কারণ ময়দানী বক্তৃতায় কোন দলিল দস্তাবেজ কিংবা আরগুমেন্ট কিংবা কাউন্টার আরগুমেন্ট দরকার হয় না। গয়রহ বললেই শ্রোতারা হাততালি দেয়। ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান এমন বহু হাততালির নীরব সাক্ষি। তবে বিএনপিকে ধন্যবাদ শেষতক মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নির্ধারিত পল্টনে তারা গেলেন সভা করতে। ঐ যে কথায় বলে নিকাতো বসলি- তবে কেন লোক হাসালি।

হরেক রকমের একাত্মতা ঘোষণাকারী ছাড়াও বিএনপির ৫০ জন সাংসদ অনশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বেগম জিয়া বক্তব্য রাখেন ৩০ মিনিট। বক্তব্যে জোরালোভাবে দেশ বিক্রির, একদশমাংশ দেশ হাতছাড়া করা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করা হলেও চুক্তির কিংবা বিলের কোন ধারার কোন বাক্য কিংবা কোন শব্দে সার্বভৌমত্ব কিংবা সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে তা খোলসা করে বয়ান করা হয়নি। পাবলিক গ্যাদারিং-এ তার দরকারও হয় না। এজন্যই সংসদ ছেড়ে পল্টনে যাওয়া। বেগম জিয়া অবশ্য তার ভাষণে অভিযোগ করেছেন চুক্তির ফলে অ-উপজাতীয়দের চিরতরে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদলাভ থেকে বঞ্চিত করেছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাসীদের রয়ালিটি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেগম জিয়া আরও বলেছেন সিলেটে গ্যাস, তেল, দিনাজপুরে কয়লা রয়েছে। প্রত্যেকে যদি রয়ালিটি দাবি করে তবে তার অবস্থা কি দাঁড়াবে!

প্রেসিডেন্ট জিয়ার যোগ্য জায়ার মতোই কথা বলেছেন বেগম খালেদা জিয়া। ঐ যে বলেছিলাম বিএনপির প্রতি পার্বত্যবাসীদের আস্থাহীনতার কথা। শুরুতেই বলেছিলাম পার্বত্যবাসীদের সম্পর্কে কথা বলতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও এখানকার আবহমানকালের জনপদের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবতার আলোকে বলতে

হবে। এই পার্বত্য এলাকাতে আঞ্চলিক পরিষদ বিল পাস হবার পূর্ব পর্যন্ত রাজা শাসিত এলাকা ছিল। রাজতন্ত্রের স্থান ছিল। এখানে প্রজারা রাজাদের সাংবাৎসরিক পুন্যায় এসে কর দেয়। কই প্রেসিডেন্ট জিয়া কিংবা খালেদা জিয়া তাদের শাসন আমলে ফেনী কিংবা দিনাজপুরে কোন রাজাতো নিয়োগ করেননি। দরকারও হয়নি। একদা প্রেসিডেন্ট জিয়া উপজাতীয়দের বিতাড়িত করে ভিটাবাড়ি ছাড়া করেছিলেন। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান একজন অ-উপজাতি হতে হবে এমন লোভ হবে কেন? বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। যে কোন মানবতা, সভ্যতা, ভব্যতা কিংবা ন্যায়-নীতির আলোকে পার্বত্য অঞ্চলের চেয়ারম্যান একজন উপজাতি হবে এটাইতো বরং স্বাভাবিক সুন্দর ও যুৎসই। কই এর আগে বেগম জিয়া কি কোন দিন বলেছিলেন চাকমা, মুরং কিংবা অন্যান্য উপজাতীয়দের রাজা হবে একজন অ-উপজাতীয়? দিনাজপুরে কয়লা পাওয়া গেলে সেখানে রয়ালিটি চাওয়া হবে-কই দিনাজপুরে এ যাবৎ কখনও রাজপুণ্যা হয়েছে বলে তো খবর পাইনি। হঠাৎ করে সিলেট ও দিনাজপুরকে এনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে মেলানোর এই সন্দেহজনক মানসিকতার জন্ম হল কেন? বিএনপি যাই বলুক একটি বন্দুকের বিনিময়ে একগুচ্ছ ফুল কিংবা এক গুচ্ছ ফুলের বিনিময়ে একটি বন্দুক পরস্পর আদান প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনপদে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক জীবনে তা হয়েছে এক অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষর রচিত বিরল ইতিহাস। ব্রিটিশ তার পূর্ণ শাসন কালে সমগ্র উপমহাদেশকে শাসন করলেও তার আইনের নাগপাশে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি মানুষদের বাঁধতে পারেনি। তার জন্য রচনা করতে হয়েছে ভিন্ন ম্যানুয়াল। পাকিস্তান ২৩ বছর পাহাড়ি মানুষদের তার রাষ্ট্র কাঠামোর গণ্ডিতে বাঁধতে পারেনি। এই সর্বপ্রথম শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাহসের বলে যে শান্তিচুক্তি হয়েছে, যার প্রথমেই বলা হয়েছে এই চুক্তি বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব কাঠামোর উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করে স্বাক্ষরিত হল। বস্তুত এই প্রথম পার্বত্য আদিবাসীদের লিখিত দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করলো।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বেগম জিয়া কাদেরকে সন্ত্রাসী বলছেন। লারমাদের? যাদের সাথে পুরো পাঁচ বছর বৈঠক করেছেন। তাহলে ঐ সকল বৈঠক কি নিছক প্রতারণা ও ভণ্ডামির ফলপ্রসূত ছিল? খালেদা সরকার উপর্যুপরি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিলেন কাদের জন্য। যুদ্ধ হয় শত্রুদের সাথে। ঐ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার মাধ্যমে বিএনপি সরকার কি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেননি যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছন্ন একটি এলাকা। কিন্তু লারমাদের সাথে যুদ্ধ করলেন, অস্ত্র বিরতি করলেন, তখন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম

স্বাধীন সার্বভৌম। আর আজ যখন যুদ্ধের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তি, হিটলিস্ট নিয়ে ঘোরাঘুরি না করে যখন পাহাড়ি বাঙালি পরস্পরকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরছে তখন বেগম জিয়া এক দশমাংশ এলাকা ভারতের কাছে চলে যাচ্ছে বলে হুংকার ছাড়ছেন। আসলে সকলই গরল ভেল। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কিছু না। চাই কেবল ইস্যু। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ইস্যু। এই সংসদের প্রথম দিন থেকেই ইস্যুর সন্ধানে উন্মাদ বিএনপি নিজেদের স্পিকারকে তার চেয়ারে অরক্ষিত রেখে অপমান করে বিএনপি ইস্যু খোঁজার যাত্রা শুরু করে সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে এসেছে পার্বত্য ইস্যু নিয়ে। শান্তিচুক্তি বাতিল করতে হবে। অর্থাৎ তাদের দাবি মেনে নিলে যে সকল শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়ে নিজদের ঘরে ফিরে গেছে সরকার আবার তাদের ডেকে হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দুদুখছড়িতে ছেড়ে আসতে হবে। আর আমাদের প্রিয় সেনা সন্তানদের পাঠাতে হবে গহীন বনে নিহত হবার জন্যে এবং এর মধ্যেই দেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই কার্য সমাধান করার জন্য বিএনপি নেত্রী লংমার্চের ঘোষণা দিয়েছেন। লংমার্চ সফল করতে হলে দ্রুত পদসঞ্চালন পূর্বক তড়িৎ অগ্রসর হতে হবে। ধীর পায়ে অগ্রসর হওয়ার কোন অবকাশ এখানে নেই। লং মার্চের সাফল্য নির্ভর করে হাঁটার ক্ষিপ্রতা ও দ্রুততার উপর। বিএনপি'র চেয়ারপার্সন কি পারবেন দ্রুততার সাথে লং মার্চ এগিয়ে নিতে?

ধর্মের নামে বিষবৃক্ষকে লালন করা হচ্ছেঃ এখনই উৎপাটনের মোক্ষম সময়

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহি-নীর কাছে টিক্কা নিয়াজী গং-এর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এদেশীয় ধর্মব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটে। তারা হানাদার বাহিনীর দোসর, খুনি, নারী নির্যাতনকারী ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র হিসাবে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। ধর্মের ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে যারা হালুয়া-রুটির ধান্ধায় নিয়োজিত ছিল, যারা বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে সদাসর্বদা ইসলামাবাদের রাজনৈতিক হেরেমে বসে তবক দেয়া পানে ঠোঁট রাঙ্গিয়ে পাঞ্জাবি প্রভুদের মনোরঞ্জনে নিয়ত ব্যাপৃত ছিল তারা ইতিহাসের সূত্র ধরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মওদুদীপন্থী বাঙালি জাতিদ্রোহী জামাতচক্র সমাজ জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার ২০ বছর পরে পুনরায় এই জাতিদ্রোহী ঘাতক রাজাকার চক্র আবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সক্রিয় হয়ে উঠলো কিভাবে? বস্তুত এদের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে 'বিসমিল্লাহ'র মাধ্যমে। যেদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ্ বলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন- সেদিনই ঘাপটি মেরে থাকা জামাত, রাজাকার চক্র আস্তে আস্তে কাছিমের মতো মাথা বের করতে শুরু করেছিল।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা কালুরঘাট বেতার মারফৎ পাঠ করে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে দেশবাসীর কাছে পরিচয় লাভ করে, পরে একজন সেক্টর

কমান্ডার হিসেবে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান রাখেন। বাঙালি বড় সহজ সরল জাতি। তারা কখনও অকৃতজ্ঞ নয়। তাই জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকার পুরস্কারস্বরূপ জাতি তাকে বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য জাতির, এই বীরউত্তম জিয়াউর রহমানই একদিন জাতিকে বিস্মিত করে দিয়ে নিজের মসনদ চিরস্থায়ী করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোরতর দুশমন রাজাকার বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শাহ আজিজকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বীর জিয়া যেদিন পরাজিত শত্রু শাহ্ আজিজের হাতে হাত রেখে রাজাকার পুনর্বাসনে ঝাপিয়ে পড়লেন, সেদিন '৭১-এর বিজয়ী জনতার কাছে তিনি আর বীরউত্তম থাকলেন না। কারণ বীর আর পরাজিত শত্রু একত্রে চলতে পারে না। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। বাংলাদেশে তাই হয়েছে।

সেই জিয়া থেকে শুরু করে এরশাদের স্বৈরশাসনের দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন করা হয়েছে স্বাধীনতা বিরোধীদের। একই সাথে ধর্মব্যবসাকে চালু করলেন আরও প্রচণ্ড গতিতে। পাক আমলের মওদুদী পন্থীদের শুধু উৎসাহিত করা হয়নি জিয়া-এরশাদ নিজেরাই বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন অবয়বে ধর্মকে রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন।

ধর্মের নামে সবচেয়ে বড় ধাপ্পাটি দেন আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তথাকথিত ঘোষণামূলে সৃষ্ট পার্লামেন্টের মাধ্যমে অষ্টম সংশোধনী পাস করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এখন দেখা যাক ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার কি সুফল ঘটেছে রাষ্ট্রীয় বা সমাজজীবনে। যারা 'ধর্ম-কর্ম করতেন না রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার পর তারা দৌড়ে গিয়ে মসজিদে মসজিদে কাতারবন্দী হয়ে ধার্মিক হয়ে গেছেন রাতারাতি? না, তা হননি। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করার পর মদ, জুয়া, দুর্নীতি প্রভৃতি ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড জিরো পয়েন্টে নেমে এসেছিলো? না, তাও আসেনি। বরং বেড়েছে। তবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ায় হিন্দুদের মন্দিরে যাওয়া, বৌদ্ধদের প্যাগোডায় যাওয়া কিংবা খ্রিস্টানদের গীর্জায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে? না, তাও হয়নি। তবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষিত হওয়ায় লাভ বা ক্ষতি হয়েছে কোথায়? অবশ্যই ক্ষতি হয়েছে। সর্বনাশ হয়েছে। এই রাষ্ট্রধর্ম একটি অশনিসংকেত। জাতির জন্য এখন একটি বিষবৃক্ষ। যতদিন এ বিষবৃক্ষটি বড় হতে থাকবে। পত্র-পুষ্প ফলেফুলে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং বিষবৃক্ষটিকে এখনই সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে একদিন হয়তো আমাদের স্বাধীনতাও বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠতেও পারে।

আজ থেকে বিশ বছর আগে কেন বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে ১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ১৮ বছর। সুকান্তের ভাষায়

যুদ্ধে যাবার শ্রেষ্ঠতম সময়। আমি কেন আমার প্রিয় জন্মভূমি পাকিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষায় ঝাপিয়ে না পরে উল্টো "জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান আজিমপুরের গোরস্থান" বলে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই রোমাঞ্চকর কঠিন দিনগুলোর কথা মনে হলেই একজন সাবডিভিশনাল কমান্ডার হিসাবে আমার চিত্ত আনন্দে ও গর্বে উচুঁ হয়ে ওঠে। আমার বুকের সীনা অন্তত ৬ ইঞ্চি প্রলম্বিত হয়ে যায়। স্বাধীনতার প্রায় ২১ বছর পরে আজ আমার বয়স ১৮ থেকে ৩৯ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমার সন্তান মুক্ত বাংলার নতুন প্রজন্ম, তারও বয়স তেরোতে পড়লো। এখন সে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছে। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে পৌঁছে দিতে হয় স্কুলে। স্কুলে পৌঁছেই কাঁধের ব্যাগটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে তাকে দৌড়ে গিয়ে এসেম্বেলিতে দাঁড়াতে হয়। সবুজ জমিনের উপর লাল সূর্যখচিত জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে সকলের সাথে আমার ছেলেও যখন কন্ঠ ছেড়ে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গাইতে থাকে, দৃশ্যতই তখন আমি দেখি আমার ছেলের শিরা উপশিরায়, নিঃশ্বাসে, প্রশ্বাসে, আবেগে অনুভূতিতে দেশপ্রেমের প্রচন্ড ঝড় বইতে থাকে। এই এসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন সে দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে এই পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা রক্ষার জন্য, প্রয়োজনে সে জীবন উৎসর্গ করতেও কুন্ঠিত হবে না। দূরে দাঁড়িয়ে আমি যখন আমার আত্মপ্রত্যয় দীপ্ত সন্তানের মুখ দেখি তখন আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। মনের ভেতর মন লুকিয়ে চিন্তা করলেই মানসপটে ছবির মতো ভেসে ওঠে আমার স্কুল জীবনের স্মৃতি। বরিশাল জেলা স্কুলের মাঠে দাঁড়িয়ে আমিও সাদা জমিনের উপর সবুজ পটে আঁকা চাঁদ-তারা খচিত একটি পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে কন্ঠ ছেড়ে গেয়েছি পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত। আজ টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া বললে কিংবা পদ্মা-মেঘনা-যমুনার জলতরঙ্গের কথা উঠলে আমার তের বছরের পুত্রের হৃদয় যেমন আবেগে উদ্বেলতার ঢেউ খেলে যায় তেমনি একদিন খাইবার থেকে সিন্ধু কিংবা ঝিলাম বিপাশার ঢেউ-এর কথা মনে পড়লেও আমার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন সে চাঁদ-তারা খচিত জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সংগীতের মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দেয়া দূরে থাক ঐ পাতাকা নামিয়ে পদদলিত করে পুড়ে ছারখার করে দিয়েছিলাম? কারণ একটাই ছিল। পশ্চিমা শাসক-শোষকদের সীমাহীন অবিরাম বৈষম্য ও অত্যাচারে জর্জরিত প্রতিটি বাঙালির মত একদিন আমিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে পাকিস্তান আমার দেশ নয়। এই পাকিস্তানে আমার অধিকার গ্যারান্টিযুক্ত নয়। এই পাকিস্তান আমার নাগরিক মর্যাদা প্রদানে ব্যর্থ। তাই যখন পাকিস্তানের অস্তিত্বের উপর হুমকি আসলো, পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার পথে, পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত হুমকির মুখোমুখি তখন পাকিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষায় ঝাপিয়ে পড়তে পারিনি। বরং ১৮ বছরের যুবক হিসাবে অস্ত্র নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লাম পাকিস্তানের কবর রচনা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায়।

এবার রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সম্পর্কে ফিরে আসা যাক। জনাব আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ

এরশাদ কি উদ্দেশ্যে এ আইন পয়দা করেছিলেন তা দেশবাসীরা জ্ঞাত। তবে এ আইন একদিন কি এক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে সে বিষয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

আমি এবং শ্রী স্বপন কুমার সাহা দু'জনেই একই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে চাকরি করি। আমরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, একই ছাত্রসংগঠনের সক্রিয় কর্মীও ছিলাম। একই ডিপার্টমেন্টে লেখাপড়া করেছি। প্রায় একই সনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা বিয়ে করেছি। আমার একটি পুত্র সন্তান আছে, তার নাম অনীক। আগেই বলেছি এবার ৭ম শ্রেণীতে পড়ে সেন্ট যোসেফ স্কুলে। স্বপনের বড় মেয়ে শিমুল। একই ক্লাসে পড়ে ভিকারুন্নেসা স্কুলে।

তারা দু'জনেই একই জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে একই সুরে একই আবেগে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গেয়ে একবুক দেশপ্রেম নিয়ে শ্রেণী কক্ষে গমন করে। শ্রেণীকক্ষে যখন শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের জাতীয় ফুল কি? অনীক বলবে, শাপলা, শিমুলও তাই। শিক্ষক যখন প্রশ্ন করবে জাতীয় পশু কি? দু'জনে বলবে ইলিশ-রূপালী ইলিশ। যখন শিক্ষক বলবে ধর্মের কথা। অনীক বলবে ইসলাম। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। এবার কিন্তু শিমুল নিরুত্তর। সে অন্যান্য সহপাঠীর মুখের দিকে তাকাবে। সঠিক উত্তর না পেয়ে কিছুটা ভিরুতা, কিছুটা হতাশা, কিছুটা ম্রিয়মাণ ও সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়বে। তার কোমল হৃদয়ে একটা প্রশ্ন আই-ঢাই করতে থাকবে।

আমরা জানি পদ্মদিঘীর শীতল শান্ত জলে কোন দুষ্ট বালক ঢিল ছুড়লে টুপ করে আওয়াজ তুলে প্রথম একটি ঢেউ আবর্তের সৃষ্টি হয়। তারপর সেই আবর্তটি আস্তে আস্তে বৃহত্তর আকার ধারণ করে সমভাবে চতুর্দিকে ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে একসময় কুলে এসে আঘাত করে। ঢেউয়ের আঘাতে কিছু বালুকণা কুল থেকে খসে পড়ে পানিতে বিলীন হয়ে যায়। এমনি আস্তে আস্তেই শুরু হয় ভাঙনের। একদিন কুলভেঙে আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তে পুকুর জলে হুমকির সম্মুখীন হয় কুলের অস্তিত্ব।

শিমুলের কচি মনে যে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তা যদি বৃত্তের মতো ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং একদিন হৃদয়ের কুলে ভাঙনের সৃষ্টি করে, তবেতো শুরু হবে কুলভাঙার সর্বনাশা খেলা। আমার আর স্বপন কুমার সাহার ১৮ বছর বয়সের অনুভূতির মতো শিমুল যদি খোদা না করুক তখন এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করে বসে যে এ পতাকায়, এ সংগীত আমার সঠিক অধিকার স্বীকৃত নয়। আমি এ মাটির ভালবাসার সমান অংশীদার নই। আর সেদিন যদি এ মাটির প্রতি ভালবাসার পরীক্ষা দেয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন যদি শিমুলেরা তার বাপদের মতো মা ও মাটির স্বপক্ষে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য কে দায়ী হবে? '৭১-এ আমরা বাংলার দামাল ছেলেরা 'জিন্নাহ মিয়ার

পাকিস্তান, আজিমপুরের কবরস্থান বলে' অস্ত্র উল্টে ধরেছি, তেমনি করে যদি শিমুলেরা, অঞ্জনেরা আর নির্মলেরা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্ম বলিদানের পরিবর্তে বিপরীত ভূমিকা রাখে, তার জন্য দায়ী হবে কারা? শিমুলেরা, না যারা রাষ্ট্রধর্মের নামে বিভেদের দেয়াল তুলে জাতিকে দুর্বল করছে তারা?

আমাদের জাতীয় জীবনের মস্তবড় ট্রাজেডি এই, মানুষ যখনই ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন দিয়ে কোন আন্দোলন সফলতার দিকে নিয়ে যায় তখনই আন্দোলনের চেতনা, মানুষের স্বপ্ন মুখথুবড়ে পড়ে। হতাশার মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় গোটা জাতি। কি প্রচন্ড আত্মচেতনা নিয়ে এদেশের মানুষ এরশাদের স্বৈরশাসনের পতন ঘটালো। তারপর এরশাদের সবকিছুই তাড়িয়ে দেয়া হল। পাল্টিয়ে দেয়া হল সবকিছু। কোনটা ভেঙে আবার নতুন করে গড়া হল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষটি এরশাদ রাষ্ট্রধর্মের নামে সযত্নে রোপণ করেছিল তার শেকড়টি উৎপাটন করা হল না। বরং বিভিন্ন মহল সেটিকে পানি দিয়ে, সার দিয়ে, কীটনাশক দিয়ে আদর যত্ন করে লালন পালন করেছে। এমনকি প্রগতিশীল ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো এনিয়ে আর উচ্চবাচ্য করছে না। শুধুমাত্র হিন্দু-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ ক্ষীণকণ্ঠে দাবী তুলছে মাঝে মধ্যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত। প্রতিবাদের ভাষাও তেমন জোড়ালো নয়। অথচ জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে, ঐক্যের প্রশ্নে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই জরুরি।

শহীদ মিনারের অবমাননা : দেখে যেন মনে হয় চিনি তাদেরে

এদের যেন চেনা চেনা মনে হয়। হ্যাঁ এরা আমাদের খুবই পরিচিত মুখ। আমি তাদের কথা বলছি যারা একুশের প্রভাতে শহীদ মিনার তছনছ করেছে। দলিত মথিত লাঞ্চিত করেছে। যাদের পায়ের নিচে মুখথুবড়ে পড়েছিল সভ্যতা। আমাদের হৃদয়ের লালিত্য আবেগ হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠেছিল সেই বিভৎস্য দৃশ্য দেখে। ফুলে ফুলে ভরে উঠা মহান শহীদ মিনারের পাদদেশের সেই তান্ডব দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে যারা প্রত্যক্ষ করেছেন কিংবা বিটিভি'র পর্দায় দেখেছেন তাদের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে দীর্ঘদিন পরও সে রক্তক্ষরণ মুছে যাবার নয়। এরা কারা? কেন এমনটি করতে গেলো। প্রথমেই বলেছি এদের চিনি। খুব ভালোভাবে চিনি। তাদের অস্থিমজ্জা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-ধমনি সবকিছুর সাথেই আমাদের পরিচয় রয়েছে। এরা হলো তারা-

- যারা একদিন বলেছিল, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা;
- যারা ৫২-র 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারি' পাখির মতো গুলি করে মেরেছিল বাংলা মায়ের দামাল সন্তানদের;
- যারা বিএনআর-এ নাম লিখিয়ে বুদ্ধিজীবী সেজে পাক-প্রভুদের উমেদারী করার জন্য উর্দু হরফে বাংলা লেখার জন্য উদ্ভট লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা চালুর ষড়যন্ত্র করেছে;
- যারা রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধের নামে বাঙালির জাতীয় উৎস মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল;
- যারা বাঙালিদের ভোটে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বন্দুকের নলের মুখে উৎখাত করেছিল;
- যারা বাঙালিদের স্বাধিকার দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহারের হুমকি দিয়েছিল;

- যারা বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, মনুমিয়া, আসাদ, ডা. জোহা, সার্জেন্ট জহুরুল হকদের বুক গুলি করে ঝাঝরা করে দিয়েছিল;
- যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের অকুতোভয় সেনানীদের কারা প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রেখেছিল;
- যারা মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম ব্যবসায় নেমেছিল;
- যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে দেশান্তরিত করতে বাধ্য করেছিল;
- যারা গায়ের জোরে '৭০-এর নির্বাচনের রায় নসাৎ করে দিতে চেয়েছিল;
- যারা '৭১-এর ২৫ মার্চ নিষ্পাপ ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল;
- যারা গণহত্যা চালিয়ে ৩০ লক্ষ বাঙালির জীবন কেড়ে নিয়েছিল এবং দু'লক্ষ মা বোনের আব্রু দলিত মথিত করেছিল;
- যারা উঠোনে শুকনো আমার মায়ের শুভ্র শাড়িকে অপবিত্র করেছিল;
- যারা আমার বোনের কোমল হাতের নম্র পাতার মেহেদীর রঙকে কলঙ্কিত করেছিল;
- যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়সী বটগাছটাকে উপড়ে ফেলেছিল;
- যারা শহীদ মিনারটিকে কামান দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছিল;
- যারা কেবলমাত্র জয়বাংলা বলার অপরাধে আমার চার বছরের শিশুর খুলি বেয়নেট দিয়ে ফুটো করে জয়বাংলার পতাকা গেঁথে দিয়েছিল এবং
- যারা আমাদের সূর্য সন্তান ও ভগবানের বর পুত্রদের চোখ বেঁধে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে খুন করেছিল।

কিন্তু এরপরও একটি অন্যরকমের ইতিহাসও তো ছিল। আমাদের জয়ের ইতিহাস। আর এতক্ষণ যাদের পরিচয় দিলাম সেই কুলাঙ্গাররা পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর ও গণহত্যাকারী, নারী নির্যাতনকারী ও কুখ্যাত রাজাকার, আলবদর, আল-শামস প্রভৃতি গণ-ধীকৃত বিশেষণে ভূষিত হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তাহলে '৯৮-এর মহান একুশের প্রভাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুলে ফুলে সুশোভিত বেদীমূলে এদের পুনর্ভাব ঘটল কিভাবে?

ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ সাল। এই সকল কুলাঙ্গারদের প্রিয় 'আব্বাজান' জেনারেল নিয়াজীসহ ৯৫ হাজার কুখ্যাত খান সেনারা যেদিন ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মিত্র বাহিনীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিল সেদিন গোটা জাতি বিজয়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলো। জাতি যখন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গাইতে গাইতে দুর্জয় প্রাণের আনন্দে রাজপথে উল্লাস মুখর সেদিন আমাদের অজান্তে এক নির্মম কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। এনবিআর-এর দালালরা পাকিস্তান

জিন্দাবাদ আপতত স্থগিত রেখে "পাকসার জমিন সাদবাদ গাঁওয়া ছেড়ে জয়বাংলা ধ্বনি দিয়ে "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" গাইতে গাইতে আমাদের বিজয় মিছিলে ঢুকে পড়েছিল। আমরা দেখলাম না। দেখলেও চিনতে পারলাম না। কিংবা দেখেও না দেখার ভান করলাম। চিনেও না চিনার মতো করে থাকলাম। এমনি এক প্রচন্ড সর্বনাশা সহ-মর্মিতার রোগে আমরা কোন এক অজানা কারণে আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। প্রায়শ্চিত্ত করার আগেই ওদেরকে আমরা বুকে টেনে নিলাম। হঠাৎ যখন বুঝতে পারলাম আমরা ভুল করেছি। ততক্ষণে ইতিহাসের চাকা তারা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। চোখের সামনে দেখলাম ভয়াল ১৫ আগস্ট '৭৫ জাতিকে শোকের অতলান্তিক মহাসমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছে। সেই তীব্র স্রোতের মুখে সামান্য খড় কুটোও রইল না। যা দিয়ে বেঁচে থাকার সামান্যতম চেষ্টা করা যায়। ইতিহাস আমাদের গালে চপেটাঘাত করে কঠিন শিক্ষা দিয়ে গেল আত্মভোলা অসতর্ক জাতিকে।

১৯৭১ সালে আমাদের কিছুই ছিল না। কেবল বঙ্গবন্ধু ছাড়া। তিনিও এক সময় আমাদের মাঝ থেকে দূরে চলে গেলেন। অথচ সেই সহস্র জোযন দূর থেকে লায়ালপুর জেলের নিচ্ছিদ্র ব্যারাক থেকে গোটা জাতিকে কি তেজদীপ্ত নেতৃত্ব দিয়ে গেলেন। তিনি এমনভাবে আমাদের সত্তাকে উজ্জীবিত এবং তিগ্মিত করেছেন আমাদের প্রাণাবেগকে যে আমরা সেদিন বিনা অস্ত্রে শত্রুকে পরাজিত করে স্বাধীনতার সুর্যটিকে ছিনিয়ে আনলাম। আর '৭৫-এর ১৫ আগস্ট আমাদের সবকিছুই ছিল- বোমারু বিমান, ট্যাংক বহর, যুদ্ধ জাহাজ, মন্ত্রী-যান্ত্রী-তন্ত্রী, এমপি, নেতা কর্মী, পুলিশ, মিলিটারি, বিডিআর, রক্ষী বাহি-নী, গভর্ণর, বাকশাল, সবকিছুই ছিল। একমাত্র ছিল না জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। নেতা ছিলেন না। আর এই ছিল না বলেই সেদিন আমাদেরকে বিনা যুদ্ধে পরাজিত হতে হল। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমাদের সিপাহসালাররা আত্মসমর্পণ করেছিল।

জাতীয় জীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতির পর সবকিছুই ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিতে অগ্রসর হয়েছে। দীর্ঘ দু'দশক ধরে স্বাধীনতার নায়কদের বসানো হয়েছে খল চরিত্রে। আর খল নায়কদের চিহ্নিত করা হয়েছে জাতীয় বীরের মর্যাদায়। দেশকে বানানো হয়েছে মিনি পাকিস্তান। আবার রবীন্দ্রসঙ্গীত বিরোধীতা। আবার মানুষের দেশান্তর হবার পালা। আত্মপ্রতারণার আবরণ দিয়ে গোটা আতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সেই ধিকৃত রাজাকার আল-শামসদের মোটা তাজা করা হয়েছে। সেই শুয়োরের দলই একুশের প্রাতে শহীদ মিনারে ঢুকে বাঙালি জাতির বুকের উপর চড়ে, দুমড়িয়ে-মচকিয়ে চিত্তকে খান খান করেছে।

কিন্তু বিটিভির পর্দায় আর একটি ভয়াবহ দৃশ্য দেখে জাতি সত্যি সত্যি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে। ঐ যাদের কথা বললাম সেই পাকিস্তানি প্রভুদের দোসর। তাদেরকে না হয় চিনলাম। কিন্তু শহীদ মিনারের ফুলগুলিকে ছিন্নভিন্ন করতে যে যুবকদের দেখলাম এরা

কারা? যুবক মানেই তো বিদ্রোহ। যুবক মানেই তো মাথা নত না করা। যুবক মানেই তো দেশপ্রেম। তবে এই কুলাঙ্গার যুবকরা আসলো কোত্থেকে।

আমরা যেদিন একাত্তরের রণাঙ্গণে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, সেদিন আমাদের জাতীয় জীবনে এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। রণাঙ্গণে আমরা ব্যস্ত ছিলাম বলে আমাদের মা বোনেরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। সেই সুযোগে কুখ্যাত পাক হানাদাররা ও তাদের এদেশীয় দোসররা আমাদের মা বোনের আব্রু নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল। কিন্তু অলক্ষে ঘটেছিল আর একটি ইতিহাস। আমাদের শান্তিবাহিনীর কর্তারা পাক সরকারের পোষা কুকুর তোষণ, পোষণ, পদলেহনীর মাধ্যমে মওকা লোটার অভিপ্রায় নিয়ে কখনও জেনারেলদের, কখনও ব্রিগেডিয়ারদের, কখনও কর্নেল মেজর সাহেবদের, আবার ক্ষেত্রবিশেষ হাবিলদার সেপাহী সাহেবদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে মেহমান বানিয়েছিলেন এবং এক সময় তাদের দিলখোশ করার জন্য কলেমা তৈয়ব পড়িয়ে নিজদের জায়া-কন্যাদের মেহমান সাহেবদের বিছানায় রেখে এসেছেন। অথবা রেখে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নিশুতি রাতের অন্ধকার যখন কেটে গেছে তখন সাহেবরা উর্দি পরে ব্যারাকে ফিরে গেছে। পিছনে রেখে গেছে দীর্ঘশ্বাস। পাপের পঙ্কিল চিহ্ন। তাদের দুষ্কর্মের দগদগে স্বাক্ষর। এমনি ভাবে আমাদেরকে পেতে হয়েছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবৈধ প্রজন্মের। ক্যালেন্ডার-এর দিকে তাকালে দেখা যাবে তাদের বয়স এখন ২৫/২৬-এর মধ্যে। বিভিন্ন দল কিংবা শিবিরের মিছিলে-মিছিলে এগুতে এগুতে তারা এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে এসেছে। সেদিন একুশের সকালে শহীদ মিনারের পাদদেশে উন্মত্ততার জন্ম দিয়েছে যুবক নামের সেই কুলাঙ্গাররা। এরা যদি এখন শহীদ মিনারের পবিত্রতা মলিন করে কিংবা রামেন্দু মজুমদার-মুনতাসীর মামুনদের ধরে বেইজ্জত করে তবে ওদের দোষ দেয়া সমীচিন হবে না। এটা তাদের জন্মের দোষ। রক্তের দোষ।

ছোটকাল থেকে শুনে এসেছি যাদের ধমনিতে পুণ্য রক্ত স্রোত প্রবাহিত তারা সমসময় মা ও মামাদের পক্ষে কথা বলে। আর যাদের ধমনিতে কু-রক্ত প্রবাহিত তারা বাপের পক্ষ হয়ে মাকে কিলায়। মামুদের অপদস্ত করে। ঠিক সেদিন যেমনটি করেছিল, তারা শহীদ মিনারের পাদদেশে কিংবা টিএসসি'র মোড়ে। এই দূষিত রক্ত পরিশুদ্ধ করতে হবে। নইলে জাতির মুক্তি নেই।

চার দলীয় জোট, নিয়াজী তত্ত্ব ও
ঢাকার রাজপথে কুশপুত্তলিকা এপিসোড

এযেন একই তারে বাঁধা। অঙ্গুলি স্পর্শমাত্রই সুরের মূর্ছনায় অনুরণীত। এবারে কেবল টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া নয়- একেবারে সিন্ধু থেকে বঙ্গোপসাগর - খাইবার গিরিপথ থেকে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। চলনে বলনে অবয়বে আঙ্গিকে একেবারে যেন সাত-পাকে বাঁধা।

ছোটবেলায় নিজ কানে শুনেছি একটি শৃগাল যখন বনের কোন প্রান্ত থেকে 'হুক্কা-হুয়া' বলে ডাক দিল তখন দিগ দিগন্ত মুখর করে সকল শৃগালকূল সমস্বরে নিশুতি রাতের গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে হুক্কা-হুয়া, হুক্কা-হুয়া বলে এমন কোরাস জুড়ে দিত তখন মনে হতো যে শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য এর চেয়ে মস্তবড় বালাই বিধাতা বুঝি আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি।

বিএনপির আপোসহীন নেত্রীর কৃপায় জাতি এই পবিত্র রমজানের প্রাক্কালে এক চমৎকার উপহার পেয়েছে। খবরের কাগজে ছাপানো হয়েছে হরেক রকম ছবি। পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখ বুলালেই কি চমৎকার এক দৃশ্য জাতির সকলের হৃদয় কন্দরে আলোড়ন ঝড় তুলেছিল। আমরা যখন কারো আগমনে উদ্বেলিত হয়ে অথবা কারো বিয়োগ ব্যথায় ম্রিয়মাণ হয়ে সুযোগ পেলে পরিবারের সকলের একটি গ্রুপ ছবি তুলে কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে পরম যত্নে বেঁধে রাখি স্মৃতির কোঠায়। তেমনই একটি পারিবারিক ছবি ফটোগ্রাফদের ফ্রেমে বাঁধা পড়ে পরবর্তীতে তার রোশনাইতে গোটা দেশ ঝলসিত হয়ে উঠেছিল। সেই পারিবারিক ছবিটি ছিল জিয়া পরিবারের উত্তরাধিকারিদের ছবি। তাঁর বিধবা স্ত্রী বেগম খালেদা, জিয়ার হত্যাকারী বলে কথিত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, এককালের নাগরিকত্বহারা এবং পরবর্তীতে জিয়ার কৃপায় বাংলাদেশে অবৈধ বসবাসকারী ঘাতক শ্রেষ্ঠ গোলাম আজম আর নারী নেত্রী বিরোধী তথা ফতোয়াবাজ মৌলবাদী গোষ্ঠির পেয়ারের লোক ফজলুল হক আমিনী। এক কথায় এদের পরিচয় স্বাধীনতার পরাজিত শত্রু পরিবার।

মারহাবা, মারহাবা বলে যেই না মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে বসে কোলাকুলি মহড়া শেষে এক লম্বা যুক্ত ইস্তেহার প্রকাশ, অমনি পুরানা দোস্ত মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সামনে প্যান্ট খুলে আত্মসমর্পণ করে জান ভিক্ষা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া পরাজিত সেনাপতি জেনারেল নিয়াজী- পুরানো দোস্ত ও দোস্তাইনদের 'মোড়েল' চাঙ্গা করার জন্য পাকিস্তানে বসে মেরে দিলেন এক হৃদয় কেড়ে নেয়া তত্ত্ব। হুবহু চতুরদলীয় ঘোষণার রূপরেখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। কি আনন্দ! চারদলীয় নেতাদের হাতে যেন প্রিয় প্রভু সান্ডার তেল মেখে দিয়ে পোক্ত করে দিলেন, জজবার অধিকারী করে দিলেন। তাই সেই শক্তিশালী হাত তেড়ে আসলো হিংস্র হায়েনার মতো নিরীহ শান্তিপ্রিয় মা-বোনদের দিকে, ঠিক যেমনটা নিয়াজীরা করেছিল '৭১ সালে। একই সান্ডার তেল মাখা হাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিল চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের লালদীঘি ময়দানে।

বর্বর পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে কোন নারী নির্যাতন করেনি- এ কথায় বিস্মিত হবার কিছু নেই। নিয়াজীদের মতো কুলাঙ্গারগণ কোনদিনই নিজদের কু-কর্মের কথা স্বীকার করার সাহস অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু তার চেয়েও কুলাঙ্গার এদেশের জন্মগ্রহণকারী পাক প্রভু নিয়াজীদের বংশদবদ, যারা নিয়াজীর কুশপুত্তলিকা কেড়ে নিয়ে তার গালে রেখে চুমো খায়। আসলে সেই কুলাঙ্গারদের মা-বোনরা কখনই পাক বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হয়নি। কারণ ধর্ষণ করার আগেই এই জামায়াত আলবদর আল শামস্ চক্র কখনও তাদের বোনদের আবার কখনও তাদের বউদের জেনারেল সাহেব, ব্রিগেডিয়ার সাহেব হতে শুরু করে ল্যান্স নায়ক সাহেবদের বিছানায় দিয়ে এসেছে সন্ধ্যায় কলমা পড়িয়ে। আবার সুবহ সাদেকের পূর্বেই তালাক নিয়ে ঘরে ফিরিয়ে এনেছে। এই অপকর্ম এরা করেছে খান সাহেবদের মনোরঞ্জন করিয়ে, খুশি করিয়ে, পদ, পদবী ও লুটপাটের মাল ভোগ করার জন্য। এছাড়াও সেদিন যারা মিছিল থেকে ছুটে এসে আমাদের মা-বোনদের কাছ থেকে নিয়াজীর কুশপুত্তলিকা কেড়ে নিয়ে গেছে তারাও তেমন অন্যায় করেনি। এটা তারা করেছে রক্তের টানে। তাদের পিতাদের কুশপুত্তলিকা কেউ পোড়াতে নিচ্ছে তখন অবশ্যই জন্মদাতাদের প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে, যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠবে- এটাইতো স্বাভাবিক।

প্রশাসনকে বিভক্ত করে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না

দেখেশুনে মনে হচ্ছে কোনও কোনও মহল ক্ষমতার মসনদ দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এসব মহলের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও লম্ফঝম্ফ দেখে সেই বহুল প্রচলিত কথাটিই মনে পড়ে যায়, 'মুর্দা দোজখমে যাক, আওর বেহেশ্‌তমে যাক, মেরা হালুয়া রুটিছে কাম।'

স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি হিসাবে আমরা একটি জ্বলন্ত ও জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছি। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কম কষ্টের নয়। গত বিজয় দিবসের এক আলোচনা মঞ্চ থেকে একজন নেতা অন্তত তিনবার বলেছিলেন, পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারবে না।

নেতাকে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না এমন আত্মবিশ্বাস তার মনে কিভাবে জন্মাল। তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। যা বলেছিলেন তা কেবল আবেগ মিশ্রিত কথা। নেতাকে বলেছিলাম, পাকিস্তান হাসিলের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন Pakistan has come to stay কিন্তু '৭১ সালে যখন জিন্নাহর পাকিস্তান আজিমপুরের গোরস্থান ধ্বনি দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যুদ্ধের ময়দানে বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন এই নেতা সেই মিছিলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। অতএব তাকে সহজেই স্বীকার করতে হয়েছে স্বাধীনতা এমন কোন জিনিস নয় যে, এটা কেউ নস্যাৎ করতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ভারত বংশোদ্ভূত ইংরেজ কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং লিখেছিলেন, 'Many nations have come and persished and left no traces. History gives very nakedly one single and simple reason for all cases. They sail because their people were not fit' একজন কবি হিসাবে কার্ডিয়ার্ড কিপলিং-এর মধ্যে আবেগ কাজ করতে পারে। কিন্তু তার আলোচ্য বক্তব্যে আবেগের কোন অবকাশ রাখেননি। তিনি কেবল ঐতিহাসিক সত্যটিকেই নিজস্ব শব্দের অলংকারে

বিধৃত করেছেন। কোনও জাতির লোক যখন যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে তখন তাদের স্বাধীনতা কিভাবে মুখথুবড়ে পড়ে সে শিক্ষা ইতিহাসের পাতায় পাতায়, কালের বাঁকে বাঁকে অসংখ্যবার চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। কেবল নেতৃত্বের অভাব ও প্রজ্ঞার অবর্তমানে বিশাল সোভিয়েত সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। খণ্ড-বিখণ্ড সোভিয়েত সাম্রাজ্যের এক একটি দেশের বর্তমান করুণ ট্রাজেডি সমসাময়িক ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ঘটনা হয়ে বিরাজ করছে।

রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সুরটি হৃদয়ঙ্গম করতে আমাদের খুব বেশি পথ পরিক্রম করতে হবে না। আমাদের নিজস্ব ভূখন্ডের আঞ্চলিক সীমানায় আমরা কেবল স্বাধীন দেশসমূহের ভাঙা-গড়ার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ার সকরুণ দৃশ্যই দেখিনি, এমনকি সহস্র বছরের গড়ে ওঠা মানব সভ্যতাও নিশ্চিহ্ন হতে দেখেছি। আমাদের এই অঞ্চলে নিশ্চিহ্ন হয়েছে আর্য, অনার্য, শক, হুন, দ্রাবিড়, মঙ্গলীয় মোগল, পাঠান প্রমুখ সভ্যতা যা হাজার হাজার বছর ধরে এ অঞ্চলের জনপদকে আলোকিত করেছিল।

অতএব, আমাদের স্বাধীনতা কেউ কোনদিন কেড়ে নিতে পারবে না এমন উক্তি করার পূর্বে কষ্টিপাথরে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে, এহেন উক্তি করার যোগ্যতা আমরা অর্জন করছি কিনা। বাস্তবের দিকে তাকালে কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠই উজ্জ্বল হয়ে সামনে এসে পড়ে। আমরা সতর্ক না হলে যে কোন মুহূর্তে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা বিপন্ন কিংবা বিপদগ্রস্ত হতে পারে। অথচ কি বিরাট মূল্যে আমরা অর্জন করেছি এই প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা।

শুরুতেই বলেছিলাম, আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব একটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত কিংবা লাভার উদ্‌গীরণ একাকার হয়ে যেতে পারে আমাদের জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব এবং এর কারণ আমাদের প্রজ্ঞার অভাব। আমাদের ক্ষমতালিপ্সু নগ্ন চরিত্র। বর্তমান মুহূর্তে যা আরও প্রকট ও ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়েছে তা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অর্থ ও স্বার্থ লোলুপ আত্মীয়-স্বজন যখন সম্পত্তি লাভের আশায় মৃত্যুপথযাত্রী পিতামহের শয্যাপাশে বসে মৃত্যুর আগমন অপেক্ষায় উন্মাদ হয়ে প্রহর গুণতে থাকে কিংবা মৃতের মাংস ভক্ষণের আশায় যেমন অজস্র শকুনী নীল আকাশে পাখা মেলে উড়তে থাকে নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, মনে হয় বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠী তেমনি ওৎ পেতে ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্ষমতা নামক মরদেহের ওপর মৃত মাংস ভক্ষণের প্রত্যাশায়।

একটি দেশে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকবে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেশের মানুষের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য থাকবে তাও স্বাভাবিক। স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠার স্বার্থে দ্বন্দ্ব থাকবে, প্রতিযোগিতা থাকবে এটাও গণতন্ত্রের মৌলিক কথা। পরস্পর ক্ষমতা পাওয়ার

আশায় প্রতিযোগিতা করবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এজন্য একে অপরের সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে, একে অপরকে দিতে হবে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে, এটা কোন গণতন্ত্র? এটা কিসের রাজনীতি? তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাত্র প্রথম ১২ দিনে ২৫ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে রাজনৈতিক সহিংসতায়। এটা কি কোন সভ্য কিংবা স্বাধীন জাতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে?

একটি বিষয় আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে। কোন দেশে রাজনৈতিক উত্থান-পতন কিংবা বিস্ফোরণের মুখে পাল্টাপাল্টি সরকারও চলতে পারে। কখনও কখনও কোন সরকার হয়ে পড়ে ডিজুয়্যার। আবার কোন কোন শক্তি ডিফেক্টো সরকার হয়ে উঠতে পারে। যেমনটি হয়েছিল '৭১ সালের পর পাকিস্তান সরকার ও বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত অঘোষিত সরকারের বেলায়। কিন্তু একটি দেশে এমন পাল্টাপাল্টি দেশপ্রেমিকতা কিছুতেই চলতে পারে না। দেশপ্রেম বিভক্ত হয়ে গেলে জাতি যে মূল ভিত্তির উপর ভর করে স্বাধীনসত্তা হিসাবে বিরাজমান তার মূলে কুঠারাঘাত হানা হয়। এমনি অবস্থায় জাতির স্বাধীনসত্তা ভেঙে পড়তে বাধ্য। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভূমিধসের মতো বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য। আজ আমাদের বড় কষ্ট হবে বলতে তবুও সত্য প্রকাশের তাগিদে এই মহাসর্বনাশা কথাটি আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের দেশপ্রেম আজ একোবরে ত্রিধাবিভক্ত, ত্রিখণ্ডিত। একদলের দেশপ্রেম স্বাধীন বাঙালি এই অনুভূতির সঙ্গে গ্রন্থিত। একদলের দেশপ্রেম ভারতের সঙ্গে গাঁথা এবং তৃতীয় অংশের দেশপ্রেম পাকিস্তানি তাহাজিব তমদ্দুনের সঙ্গে বিনেসুতোয় গাঁথা মালা হয়ে হৃদয়ে একাকার হয়ে আছে। বিতর্ক থাকতে পারে এই তিন অংশের সংখ্যা নিয়ে। কোন অংশের পাল্লা অবশ্যই একটু ভারি হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কথায়, কাজে, আকৃতিতে, আঙ্গিকে, অভিপ্রায়ে এটা প্রমাণিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ জুড়ে যে ১২ কোটি কিংবা ১৩ কোটি মানুষ বসবাসরত তাদের দেশপ্রেম এই ত্রিধারায় বিভক্ত এবং এই সর্বগ্রাসী বিভাজনকে ভিত্তি করেই বলতে বাধ্য হয়েছি যে, আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে টলমল করছে। এই অবস্থায় যে মুহূর্তে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার সেই সময় কিছু কিছু রাজনৈতিক মহল কেবল গদি দখলের অদম্য লিপ্সায় জাতিকে সর্বনাশা বিভক্তির চোরাবালিতে নিমজ্জিত করতে উদ্যত হয়েছে ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো। হৃতশাবা বাঘিনীর মতো, মত্ত মাতঙ্গের মতো। আর এখানেই সৃষ্টি হয়েছে আমাদের জাতির জন্য মহাবিপদ সঙ্কেত। সর্বনাশা অশনি সংকেত।

১৫ জুলাই যে মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত করে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ করছিল সেই মুহূর্তে আমাদের দেশের একটি রাজনৈতিক স্রোতধারা কেবল সেই চিত্তের আবেগ ভেজা অনুষ্ঠান বয়কট করে ক্ষান্ত হয়নি একই সময়ে হুঙ্কার ছুড়েছে প্রশাসনের সর্বস্তর থেকে আওয়ামী

সমর্থকদের সরাতে হবে। এই ঘোষণা ও পরবর্তী সময়ে পাল্টা ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাতি অতি অস্থির ও উদ্বেগ সঙ্কুল হয়ে লক্ষ করছে প্রশাসনকে কি নিষ্ঠুর নির্মম ও নগ্নভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে বিভক্ত করা হচ্ছে। সরকার আসবে সরকার যাবে। এর বিচার বিশ্লেষণ করবে জনগণ। দেশের জনগণই হবে সরকার নির্ধারণের মূল শক্তি। একথা আমাদের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে। কিন্তু দেশের সংবিধান কিংবা কোন আইনে কোথায় লেখা রয়েছে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনও পরিবর্তন হতে হবে। বিগত সরকারের মন্ত্রীরা যেমন পদত্যাগ করে স্ব স্ব গৃহে চলে গেছেন তেমনিভাবে গত পাঁচ বছর প্রজাতন্ত্রের যেসব কর্মচারী তাদের সঙ্গে কাজ করেছে তাদেরও বিদায় নিতে হবে দায়িত্ব থেকে? অবস্থা তো এখন এমনিতেই মনে হচ্ছে বিএনপির চেয়ারপার্সন নিজেই ঘোষণা করেছেন প্রশাসন ও নির্বাচনকে সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। এর অর্থ কি এই যে, এদের সরিয়ে যাদের আনা হবে তাদের হতে হবে বিএনপি সমর্থক। আর এদের সরিয়ে কোথায় তাদের বসানো হবে? যেখানেই বদলি করা হোক প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে তাদেরকে তো কাজকর্মই করতে হবে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক একাংশ যদি এদের পার্টি বিশেষের সমর্থক বলে চিহ্নিত করে তবে তাদেরকে অন্যত্র বদলি নয়, প্রজাতন্ত্রের কর্ম থেকেই অব্যাহতি দিতে হয়। তখন অন্য রাজনৈতিক দল আরেক দল সরকারি কর্মচারীকে তাদের প্রতিপক্ষের সমর্থক বলে আখ্যায়িত করে তাদের অপসারণ চাইবেন। এটা জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়, কাঙ্ক্ষিতও নয়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শপথ গ্রহণের পরদিনই বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করার সময় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন কমিশনের সদস্য শফিউর রহমানকে পদত্যাগ করার জন্য তারা বলবেন। তাদের ভাষায় শফিউর রহমান আওয়ামী লীগের সমর্থক। এ বিষয়ে পরবর্তী সময় একুশে টিভির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী সরকারের অন্যতম নীতিনির্ধারক জনাব তোফায়েল আহমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'তারা বলেছেন শফিউর রহমান আওয়ামী লীগের সমর্থক তাই তাকে পদত্যাগ করতে হবে। তাহলে বাকী চারজন কি বিএনপির সমর্থক? প্রশাসনকে ঘিরে এমন সর্বনাশা খেলা চলতে পারে না। এটা জাতির কাছে কাম্য নয়, কাঙ্ক্ষিত নয়। মঙ্গলজনক নয়।'

আমাদের প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্র সম্পর্কে অনেক অভিযোগ থাকতে পারে। গুরুতর অভিযোগও থাকতে পারে। তবে এটা সত্য নয় যে, সব ভাল কাজ রাজনীতিবিদগণ করেন আর সব দুষ্কর্ম সম্পাদিত হয় আমলাদের দ্বারা। প্রকারান্তরে এটাও সঠিক নয় যে, দেশের সব অমঙ্গল ডেকে আনেন রাজনীতিবিদগণ আর দেশকে সোনায় সোহাগা ভরিয়ে তুলেন আমলাগণ। আসল সত্য এই যে, আমাদের যা কিছু অর্জন, যা কিছু

ভালমন্দ সবই রাজনীতিবিদগণ এবং প্রশাসনের যৌথ ফসল। কি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কি '৯৮-এর ভয়াবহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা পার্বত্য শান্তিচুক্তি আর পানি চুক্তি সবকিছুতেই আমাদের সরকারি কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বরং রাজনৈতিক মহল থেকে কেবল দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। আর সেটা বাস্তবায়নের কঠিন কঠোর দায়িত্ব পালন করে প্রশাসন। যখন যে রাজনৈতিক মহল রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসবে তারাই তাদের মতো করে দিক দর্শন সাব্যস্ত করবে আর তা সঠিক সুচারুভাবে বাস্তবায়ন করবে প্রশাসন।

অতএব, এই ধ্রুব সত্যটি যেন আমরা ভুলে না যাই। ইতিমধ্যে ত্রিধারায় প্রবাহিত দেশাত্মবোধক রোগে বিভক্ত দেশে আমরা যেন আবার আরেকটি বিভক্ত প্রশাসন দাঁড় করিয়ে জাতিকে আরও গভীর সংকটে নিপতিত না করি সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে সকল রাজনীতিবিদদেরই।

সাহিত্যের বরপুত্র শ্রী অন্নদাশংকর রচিত কবিতাটি মনে পড়ে–

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক
বাঙালি বলতে একজন আছে
দুর্গতি সব ঘুচে যাক।

অন্নদাশংকর রায় এ কথা লিখেছিলেন ভারত তথা বাংলা বিভক্তির প্রেক্ষাপটে। আজ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটকে লক্ষ্য করে আমাদের বলতে হবে আমরা জাতি হিসাবে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছি। ভেদ-বিভেদ ও হানাহানিতে সমাজের সর্বস্তরে কেবলই কুল ভাঙার প্রতিধ্বনি। এ অবস্থায় আমাদের আমলাতন্ত্র কোনমতে টিকে আছে। ভুল করে রাজনৈতিক মহল তাদের দু'ভাগ করে ফেলেননি। আমাদের প্রশাসনটি ঐক্যবদ্ধভাবে বেঁচে থাকলে জাতির দুর্গতি কিছু ঘুচতেও পারে। আমাদের রাজনৈতিক মহল বিষয়টি উপলব্ধি করবে বলে সবার প্রত্যাশা।

দেশপ্রেমের সোল এজেন্সি!

'আর এক মুহূর্তও তার এ দেশে থাকার অধিকার নেই', প্রচণ্ড উত্তেজনা মিশ্রিত কণ্ঠে এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন জ্বালানী উপদেষ্টা ও বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান। আর যাকে উদ্দেশ করে তিনি এই নিদারুণ শক্ত কথাটি উচ্চারণ করেছেন তিনি হলেন দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের অপরাধ, তিনি নাকি বাংলাদেশকে একটি খারাপ পণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের যদি এ দেশে এক মুহূর্তও থাকার অধিকার না থাকে তবে তিনি যাবেন কোথায়? কোন দেশে? তিনি (মাহমুদুর রহমান) তো মানহানির মামলা করেছেন মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। শুধু দেশ ছাড়তে বলেছেন দেবপ্রিয়কে। তবে রেহমান সোবহান, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, এম সাইদুজ্জামান ও লায়লা রহমান কবির এরা কি করবেন তা বলেননি। যদিও তিনি দেশবরেণ্য এসব ব্যক্তিত্বকে ষড়যন্ত্রকারী ও নির্লজ্জ মিথ্যাচারী বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

যারা সেদিন মামলা করে আসার পর মাহমুদুর রহমানের উগ্রমূর্তি একাধিক টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছেন তারা অবশ্যই অনুভব করেছেন ড. দেবপ্রিয়ের বিরুদ্ধে তিনি কী জঘন্য সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করছেন। প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা আমাদের পবিত্র সংবিধানের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতের শামিল।

এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ প্রায়ই দলীয় স্বার্থে এবং স্বভাব দোষে এভাবে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখেন। জাতীয় সংসদের পবিত্র ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বাজে কথায় পটু এক মন্ত্রীকে বলতে শুনেছি, হালদার, মালদাররা (প্রয়াত; সুধাংশু শেখর হালদার) তো ডাবল প্রটেকশনে আছেন। তাদের আবার চিন্তা কি? আরেকজন সরকারি দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলেছেন, যখন দেখি বাবু সুরঞ্জিতের ইশারায় শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের সদস্যরা সংসদ বয়কট করে বের হয়ে যায় তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই ইঙ্গিত আসে কোথা থেকে?

এই ভাবে দিনের পর দিন সুধাংশু শেখর হালদার আর সুরঞ্জিত সেনগুপ্তদের দেশপ্রেমে কটাক্ষ করে কথা বলা হয়। বংশ পরমপরায় যারা বাংলাদেশে বসবাস করে আসছেন, জননী জন্মভূমির সুখে-দুঃখে যাদের হৃদয় চিরআবর্তিত তাদের বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে ভারতকে জড়িয়ে কটু মন্তব্য করা হয়। তবে এসব মন্তব্য রাজনীতির দুষ্টচক্র থেকে উপস্থাপিত হলে তারও একটি মানে থাকে। কিন্তু মাহমুদুর রহমানের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য কীভাবে মেনে নেয়া যায়? কেবল দেবপ্রিয় ভট্ট্রাচার্যই নয়, এহেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ঘৃণ্য শিকার হয়েছিল হাজার হাজার দেশপ্রেমিক মানুষ, এমনকি দেবপ্রিয়ের স্বনামধন্য পিতা বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যও। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন। জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তার যখন প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা তখন হঠাৎ করে রাতারাতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বয়স কমিয়ে তাকে অবসরে পাঠানো হয়। আবার তিনি অবসরে চলে গেলে পুনরায় বিচারপতিদের বয়স পূর্বাবস্থায় নির্ধারণ করা হয়। একই তেলেসমাতি করে একজন পছন্দের লোককে আগামী তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান করার জন্য আবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বয়স বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ছোটবেলায় কবিতায় পড়েছিলাম, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে / কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।' কিন্তু সেই সোনার ছেলের চেয়ে কথায় কিংবা বাগাড়ম্বরে পটু লোকজনই আমাদের সমাজ শাসন করে বেড়াচ্ছে। এই যেমন মাহমুদুর রহমান। যে দুটি বিভাগের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছে তার দু'টিরই বারোটা বেজেছে। কিন্তু মাহমুদুর রহমানের মুখে খই ফুটছে। অথচ তার জ্বালানি দফতরের জ্বালায় দেশবাসী অস্থির। সারাদেশ অন্ধকারে। কেবল টিভির পর্দায় জ্বলজ্বল করছে মাহমুদুর রহমানের চেহারাটি।

দেশের মানুষ দাবি করে আসছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। এমনকি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টও একাধিকবার সরকারকে সতর্ক করেছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় তথা বিচার বিভাগের পৃথকীকরণে ব্যর্থ হওয়ার জন্য। আজ যদি বিচার বিভাগ স্বাধীন হতো তবে মাহমুদুর রহমানের মতো একজন বাকসর্বস্ব দুর্নীতিগ্রস্ত আমলার মামলা জারিতে কোন বিবেকবান ম্যাজিস্ট্রেটই দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এ কারণে গ্রেফতার পরোয়ানা জারি করতেন না। তাদেরকে সমন দিলেই তারা কোর্টে এসে হাজির হতেন। ক্ষমতার দম্ভে এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই মাহমুদুর রহমানের এই দুঃসাহস। দেশবরেণ্য সন্তানদের বিরুদ্ধে এই হুঙ্কার। এ কারণেই মন্ত্রী-তন্ত্রী ও হোমরা-চোমড়া-নোংরাদের তর্জন-গর্জনে সমাজে মুক্ত চিন্তা নির্বাসনে। দেবপ্রিয়কে দেশ ছাড়ার হুমকি দেয়ার আগে মাহমুদুর রহমানের ভাবনা-চিন্তা করা উচিত বাংলাদেশটা কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের অধিকার আছে নিরুপদ্রব নির্ভাবনায় এ দেশে পূর্ণ মর্যাদায় বসবাস করার।

জেনারেল অরোরার মৃত্যু ও শোকপ্রস্তাব বিষয়ক জটিলতা : জাতির সঙ্গে এ কেমন প্রতারণা?

এবার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল শোকপ্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে। রেওয়াজ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের যে কোনো অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে শোকপ্রস্তাব আনা হয়। সাধারণত তা পাসও হয় সর্বসম্মতভাবে। এবারো এর ব্যতিক্রম হয়নি। কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তির মৃত্যুতে স্পিকার মো. জমির উদ্দিন সরকার শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্য এবং জাতিসংঘ শান্তি মিশনে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সামরিক বাহিনীর সদস্য। এছাড়া বিদেশীদের মধ্যে ছিলেন পোপ জন পল।

সেদিন শোকপ্রস্তাবের ওপর বক্তৃতায় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী স্পিকারকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, এই তালিকায় সদ্যপ্রয়াত ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের সাবেক অধিনায়ক লে.জে. অরোরার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হোক। জাতীয় বিবেচনায়ও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাদের সিদ্দিকীর কাছে এটি ছিল স্পর্শকাতর। কারণ, জে. অরোরা বাঙালি জাতি তথা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে জড়িয়ে আছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের চরম ক্রান্তিকাল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মিত্র বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান। জে. অরোরার কাছেই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর প্রধান লে.জে. নিয়াজী ৯৩ হাজার ঘাতক সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এই মহান ও অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর মানচিত্রে সংযুক্ত হয় আরো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। কাজেই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর এই আবেদন অন্যান্য দাবীর মতো অতি সহজে নাকচ করা স্পিকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তিনি তা

করেনওনি। তবে স্পিকার অতি সাদামাটাভাবে জানান, কারো নাম শোক প্রস্তাব থেকে বাদ গিয়ে থাকলে নামের তালিকায় তা সংযোজন করা হবে। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী পরের দিন আবার ফ্লোর নিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে জে. অরোরার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণে স্পিকারকে অনুরোধ করেন। জবাবে স্পিকার সংসদকে অবহিত করেন, অরোরার পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে যথাযথভাবে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।

এর কয়েক দিন পর আবার বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী প্রথমে জে. অরোরার ওপর শোক প্রস্তাব গ্রহণের অঙ্গীকারের প্রতি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জবাবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি জানান, প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। হতভম্ব কাদের সিদ্দিকী বিস্ফোরিত চোখে আক্ষেপ করে বলেন, 'আমাদেরকে বলা হয়েছিল জে. অরোরার পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে একটি আনুষ্ঠানিক শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। অথচ মাননীয় স্পিকার আপনি জানালেন শোকপ্রস্তাবটি ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা জানতে পারলাম না শোকপ্রস্তাবে কি লেখা হয়েছে, কেমন করে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিভাবে তা পাঠানো হয়েছে।'

স্পিকারের কথায় কাদের সিদ্দিকীও বুঝলেন, সাংসদরাও বুঝলেন আর সেই সঙ্গে গোটা জাতিও বুঝল জে. অরোরার ওপর গৃহীত শোক প্রস্তাবের দশা কি হতে পারে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হানাদারমুক্ত করায় যার বিশেষ অবদান ছিল সেই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের দৈন্যদশা আমাদের লজ্জায় নিমজ্জিত করেছে। জাতি হিসেবে আমরা কখনো এতটা কৃপণ ছিলাম না। আসলে এখানে যুৎসই শব্দটি হচ্ছে অকৃতজ্ঞ। তবে এই শব্দটির ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা দুটিই আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষস্বরূপ হতে পারে বিধায় কৃপণ শব্দটি ব্যবহার করা হলো। আবহমানকাল থেকে বাঙালিরা বীরের জাতির মর্যাদা ভোগ করে এসেছে। কারো এতটুকু অবদান ও ত্যাগ তারা কখনো খাটো করে দেখার চেষ্টা করেনি। বরং সবার অবদান হৃদয় উজাড় করে দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথায়ই আসা যাক। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। কেউ বুঝে গিয়েছেন, কেউ আবার না বুঝে গিয়েছেন। আবার কেউ 'অন্য উদ্দেশ্য' নিয়েও মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে প্রতিভাত হয়েছে যে, অনেক বীরযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে গেলেও হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

হৃদয়ে ধারণ করতে পারেননি, অথবা ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে আত্মসুখের তাগিদে সেইচেতনা বিসর্জন দিয়েছেন। নিজে বীরযোদ্ধা হয়েও অবলীলাক্রমে পরাজিত শত্রুর সাথে দহরম-মহরম করেছেন। ক্ষমতার লালসায় বিজয়ী বীর আর পরাজিত কাপুরুষ পাশাপাশি বসেছেন। খোশগল্পে মেতে উঠেছেন। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে গিয়ে সহমর্মিতার উন্মাদনা প্রদর্শন করে মূলত '৭১-এর বিজয়ী জাতির ললাটে এঁকে দিয়েছেন ঘোর কালিমা। তবুও আমরা কৃতজ্ঞ জাতি হিসাবে যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের অবদান বিচার করে বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম, বীর বিক্রম, বীর প্রতীক বিভিন্ন উপাধিতে তাদেরকে মহিমান্বিত করেছি। লে.জে. অরোরাকে কোন পদকের ফ্রেমে বাঁধা না গেলেও গোটা জাতির হৃদয়ের গভীরে স্থান দিয়ে তার ঋণ শোধ করতে চেয়েছি। অথচ তার মৃত্যুতে জাতীয়ভাবে শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা কখনোই আমাদের জাতির চরিত্রের সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ভারতের লাখো কোটি মানুষের যে রাখিবন্ধন এটা কেবল ভৌগোলিক নৈকট্য, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কূটকৌশল কিংবা পারস্পরিক স্বার্থ হাসিলের যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগের সমীকরণের মধ্য দিয়ে নিরূপণ করা যাবে না। সবকিছু ছাপিয়ে এখানে মানবতা-মানবিকতা মাথা উঁচু করে উঠে আসবে। ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে জাতির জীবনে কতই না উত্থান-পতন ঘটেছে। জন্ম হয়েছে কত হৃদয়স্পর্শ কাহিনী। জে. অরোরাকে সম্মান জানাতে যারা কুণ্ঠাবোধ করেন তাদের বাদ দিলে জাতির সবার হৃদয়েই চিরস্থায়ী হয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে বাংলাদেশ ও ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা অবিচ্ছেদ্য ও প্রীতিময় সখ্য। এই সম্পর্ক সাধারণ রাষ্ট্রাচারের বহু উর্ধ্বে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এই সম্পর্কের মূল্যায়ন করার অবকাশ নেই।

একটি ছোট্ট অথচ আবেগঘন ঘটনার উল্লেখ করলে এর যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যাবে। শিশির বিন্দুর মাঝে যেমন সীমাহীন অতলান্তিক সমুদ্রের গভীরতা অনুভূত হয় তেমনি বিচ্ছিন্ন এই ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রমাণ করা সম্ভব '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে গড়ে উঠা বাংলাদেশ ও ভারতের মানুষের হৃদয়াবেগ কি প্রচণ্ড ক্ষুরধার ও অনন্য মহিমায় ভাস্বর ছিল।

'৭১-এর সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। আমাদের নিয়ে দুরন্তবেগে ছুটে আসা ট্রেনটির গতি শ্লথ হয়ে আসল। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্ণৌর আউটার স্টেশনে এসে 'ডেডস্টপ' হয়ে

গেল। আমরা যারা দীর্ঘ সময় ধরে আঁকাবাঁকা ট্রেনটির ছন্দায়িত চলার গতির সঙ্গে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, ট্রেনটি থামার সঙ্গে সঙ্গেই এলার্ট হয়ে গেলাম। মুহূর্তেই বেজে উঠল পরিচিত বাঁশির হুইসেল। বুঝতেই পারলাম মেজর এইচ জি গুরাং আমাদেরকে 'ফল-ইন' করতে বলছেন। উত্তর প্রদেশের দেরাদুনস্থ বিশ্বখ্যাত টাণ্ডুয়া মিলিটারি একাডেমিতে সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার সময় দীর্ঘ তিন মাস ধরে প্রতিদিন আমরা এই হুইসেলের শব্দে ঘুম থেকে উঠে এসেম্বেলিতে গিয়েছি। আবার একই বাঁশির শব্দ শুনে রাতে ব্যারাকে ঘুমোতে গিয়েছি।

১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের মানুষ মহান মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত। আগস্টের প্রথম দিকে আমরা আগড়তলা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি পরিবহন বিমানে করে দেরাদুনে এসেছিলাম। সেখান থেকে সামরিক ট্রাকে চড়ে টাণ্ডুয়া মিলিটারি একাডেমিতে। আমাদেরকে রিক্রুট করা হয়েছিল বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সের সদস্য হিসেবে, সংক্ষেপে বলা হত বিএলএফ। তবে যুদ্ধরত বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিএলএফ-এর পরিচয় ছিল মুজিব বাহিনী নামে।

এই মুজিব বাহিনীর ট্রেনিংপ্রাপ্ত ১৫তম ব্যাচের তিন'শ গেরিলা যোদ্ধা নিয়ে ট্রেনটি সম্ভবত শাহরানপুর শহরের একটি স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই বিশেষ ট্রেনটির গন্ত ব্য ছিল আগরতলা। এখান থেকেই সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারূপে আমাদের বাংলাদেশের অভ্যন্ত রে ইনডাক্ট করার কথা।

মেজর গুরাংয়ের বাঁশির হুইসেল শুনে আমরা ট্রেন থেকে নেমে 'ফল-ইন' হলাম প্রশস্ত প্রান্তরে। আমাদেরকে বলা হল যে, প্রচণ্ড বাতাসের জন্য চলন্ত ট্রেনে রান্নার অসুবিধা হচ্ছে। অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এখানে ট্রেনটি ঘন্টা দুয়েক থামবে। রান্না শেষে আমরা মধ্যাহ্নভোজ সেরে পুনরায় গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু করব। আমাদেরকে আরো বলা হয়, ইচ্ছা করলে আমরা ট্রেনেই সময় কাটাতে পারি এবং এটাই কাম্য। তবে কেউ ইচ্ছে করলে একটু এদিকে সেদিকে ঘুরে ফিরে দেখতে পারে। তবে আমাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল আমরা যেন দূরে কোথাও না যাই। নিষ্প্রয়োজনে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে 'বাৎচিত' না করি। বিশেষ করে নিজেদের পরিচয় কিংবা গন্ত ব্যস্থান নিয়ে কথা না বলাই ভালো।

যাহোক, নির্দিষ্ট সময়েই আমরা সকলে ট্রেনের কাছে পৌঁছে গেলাম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির ফলে আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত ছিলাম। ট্রেনের কাছে আসতেই 'কিচেন বগি' থেকে খাবারের সুঘ্রাণ নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করায় ক্ষুধার তীব্রতা আরো বেশি অনুভূত

হতে লাগল। আমরা যে মুহূর্তে খেতে যাওয়ার জন্য উসখুস করছিলাম তখনি আমাদের হৃদয় কাঁপিয়ে বাঁশির হুইসাল বেজে উঠল। এবার বাঁশি বাজালেন মেজর রূপ সিং। এই বাঁশির হুইসালে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। নিশ্চয়ই কোনো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছে আমাদের কোন সহযোদ্ধা এবং দেশে ফেরার পথে আমাদেরকে হয়তো বকাঝকা খেতে হবে। তবুও হুইসাল বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে 'ফল-ইন' হতে হল।

আজ স্বদেশ ফেরার পালা। একদিন টাণ্ডুয়াতে এসেছিলাম কাঁচামাল হিসেবে। আজ ফিরে যাচ্ছি দুর্দান্ত গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমরা সকলে উন্মুখ। এমনি সময় না জানি কোন অবিমৃষ্যকারী দুষ্কর্মের জন্য আমাদেরকে আবার বকাঝকা খেতে হবে। তবে মেঘের ফাঁকেও রোদের ঝলক দেখলাম। 'ফল-ইন'-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন মেজর দেবদাস। টাণ্ডুয়া মিলিটারি একাডেমির সবেধন নীলমণি একমাত্র বাঙালি অফিসার। তাও মেডিকেল কোরের। বাঙালিত্বের কী বিরাট আকর্ষণ, কী দূরন্ত এর প্রাণশক্তি এই দূরদেশে অবস্থিত টাণ্ডুয়া এসে তা বুঝতে পেরেছিলাম অস্থিমজ্জায়। যখনই কোনো দুঃসংবাদ কিংবা বিপদ সমাগত মেজর দেবদাস সাক্ষাৎ দেবতার মতো আমাদের মধ্যে এসে হাজির। একে তো বাঙালি, তার উপরে নাম দেবদাস। কোথায় মেজর ফেজর। আমরা সকলেই তাকে ডাকতাম দেবদা বলে। এটা তিনি আশাও করতেন। আজও যখন লক্ষ্ণৌর রেল স্টেশনে আমরা অজানা অমঙ্গল চিন্তায় অধীর অপেক্ষমান তখন এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে, বকা খেলেও যাওয়ার বেলায় বাঙালির মুখ থেকে বকা খাব। আর দেবদা কতটুকুই বকতে পারবেন?

মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখলাম বিভিন্ন বয়সের একদল মহিলা আমাদের দিকে এগুচ্ছে। এবার আর বিপদ অজানা রইল না। এমন একটি আশঙ্কা আমরা শুরুতেই করেছিলাম। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজনকে দেখলাম নিকটস্থ কলোনির দিকে যেতে। সন্দেহ হয়েছিল তারা কী জানি কী করে বসে। এবার মহিলাদের আসতে দেখে আমরা নিশ্চিত হলাম আমাদেরই কোনো কোনো বন্ধু যারা পার্শ্ববর্তী কলোনিতে গিয়েছিল না জানি তারা কী গর্হিত কাজই করে ফেলেছে।

কিন্তু মহিলাদের বর্ণাঢ্য মিছিলটি খুব কাছে এলে কেমন জানি অন্য একটি আবহ, অন্য একটি মেজাজ আমাদের কাছে অনুভূত হল। সকলেই সুন্দর করে পরিপাটি সাজে সজ্জিত। প্রত্যেকের হাতেই আল্পনা আঁকা ডালাকুলা। একটু আবেগ ও কম্পন জড়িত

কণ্ঠে মেজর দেবদাস সামরিক কায়দায়ই একটি ছোট্ট ভূমিকা দিতে গিয়ে বললেন, আগত এই মহিলাগণ নিকটস্থ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের আবাসিক কলোনির বাসিন্দা। তোমাদের কয়েকজন ছেলে এই কলোনিতে গিয়ে জল খেতে চাইলে প্রথমে মহিলারা শুনতে পায় এই ট্রেনে জয়বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং শেষে স্বদেশে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। এতদিন তারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা কিংবা রেডিও-টিভিতে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা পড়েছে কিংবা শুনেছে। আজ তাদের সৌভাগ্য হয়েছে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে কিছু বাংলা মায়ের তরুণ ট্রেনে চড়ে যাচ্ছে, এখন তারা তোমাদেরকে এক নজর দেখার ও আর্শীবাদ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

এরই মধ্যে দেবদা একজন পৌঢ় গোছের মহিলাকে ইঙ্গিত করলে তিনি সামনে এসে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে বললেন, তোমরা আমাদের ভাই ও সন্তানতুল্য। তোমাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও যুদ্ধ জয়ের খবরে গোটা বিশ্ব আজ মুগ্ধ। আমরা তোমাদের বিজয় কামনা করি। তোমাদের শুভ কামনা করি। আমরা আজ আরো আনন্দিত এই জন্য যে, আজ ভাইফোঁটার দিন। রাখিবন্ধনের দিন। তাই আমরা তোমাদের শুভ কামনায় রাখি বেঁধে দিতে এসেছি। তোমাদের কোমল-কঠিন হাতে, আজ ভাইফোঁটা দিয়ে শুভ কামনায় সিঁদুর পরিয়ে দিতে চাই তোমাদের প্রশস্ত ললাটে। এরপরই প্রতি লাইনে দুজন করে মহিলা হাতে ডালা-কুলা নিয়ে আমাদের প্রত্যেককে রাখি বেঁধে দিতে লাগলেন এবং একই সঙ্গে ললাটে রক্তলাল সিঁদুর ও চন্দনের ফোঁটা।

দীর্ঘদিন আমরা দেশান্তরী। প্রিয় মাতৃভূমিতে আমরা আমাদের মা-বোন, ভাবীদের রেখে এসেছি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। আমরা অনেকেই জানি না আমাদের স্নেহময়ী জননী বেঁচে আছেন নাকি পুত্রশোকে মৃত্যুর শীতল কোলে ঢলে পড়েছে। আমরা অনেকেই জানি না আমাদের জায়াদের নম্র হাতের কোমল পাতায় কোনো গ্লানি কলঙ্কিত করেছে কিনা, বোনদের রজনীগন্ধার মতো পবিত্রতা এখনো নিষ্কলুষ আছে কিনা। এমনি মুহূর্তে আজ লক্ষ্ণৌর রেলস্টেশনে ছুটে আসা সরকারি আবাসিক কলোনির মাতা-ভগ্নিদের দেখে আমাদের চোখের সামনে ভেসে এসেছে স্বদেশের ভূমিতে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে আসা আমাদের প্রিয়জনদের কথা। প্রিয় মাতৃভূমির মাটি ও মানুষের কথা। হিজল ফুল, কন্টকারীর ঝোপ, তিল্লৎপাতার হলুদ ফুল, কাজলা দিঘি, শানবাঁধানো ঘাট সবকিছুর কথা।

সেই আকুল আবেগ মাখা লক্ষ্ণৌর স্টেশন ছেড়ে এসেছি আমরা পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

এরই মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কত জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ক্ষরা ও প্রকৃতির বিপর্যয়। পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে আসলেও মনে হয় এই সেদিনের কথা। আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুখ ছিনিয়ে আনতে তিরিশ লাখ প্রাণের রক্ত ঢেলে দিয়েছি। একইসঙ্গে আমাদের মাতৃভূমি হানাদারমুক্ত করতে আত্মবিসর্জন দিয়েছে সাড়ে এগারো হাজার ভারতীয় সৈন্য। পরদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই আত্মদান নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এই রক্তের রাখি বন্ধনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন।

আমরা যখন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কথা বলব তখন অবশ্যই ওই সাড়ে এগারো সহস্র ভারতীয় জওয়ানদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করব, বিবেচনায় আনবো। আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে লক্ষ্ণৌর রেল স্টেশনে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ও ভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্ট রাখি বন্ধনের কথা। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। আমাদেরকে দৈন্য ঘুচাতে হবে। আমাদের কোনো একটি স্বাধীনতা দিবসে অথবা বিজয় দিবসে আমরা মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে.জে. অরোরাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি, কিংবা ভারতীয় যোদ্ধাদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্মাণ করতে পারিনি। এই দৈন্য বীরের জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গ্লানিকর। ইতিহাসের তাগিদেও এটা আমাদের করা দরকার। আমরা শৌর্যবীর্যশালী বীরের জাতি। আমাদের সম্মানবোধ রয়েছে। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করতে গিয়ে রেটকিন নামে একজন সোভিয়েত নাবিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কর্ণফুলীর তীরে আমরা রেটকিনের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রতি বছর মানুষ গিয়ে রেটকিনের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসে। এটাই শোভন। এটাই কর্তব্যবোধ। একই কারণে আমাদের স্বাধীনতার বেদিমূলে আত্মোৎসর্গকৃত ভারতীয় বীরদের জন্য গড়ে তোলা উচিত ছিল এক বিশাল স্মৃতিসৌধ।

একইসঙ্গে আজ ভারতকেও একটি ধ্রুব সত্য অনুধাবন করতে হবে- ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী। বিশাল প্রতিবেশী। এমতাবস্থায় আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টিকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ ভারতের থাকতে পারে না। আমাদের সকল সমস্যা ছোট কিংবা বড় সবই আমাদের অনুকূল পরিবেশের মাধ্যমে সমাধান করার উদ্যোগ নিতে হবে ভারতকেই। বাংলাদেশকে যদি তার সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ হতে হয় সেটা ভারতের জন্যও হবে দুঃখ ও বেদনার। রাজনৈতিক পরাজয়ও।

অতএব এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সেতুবন্ধন করতে গিয়ে কেবল

প্রচলিত রাষ্ট্রাচার কূটনৈতিক কলাকৌশল ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট পরিভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এই দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু আবেগের স্থান থাকতে হবে যেই আবেগের তাড়নায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে লক্ষ্ণৌর সরকারি কলোনির মা-বোনেরা ঘর থেকে ছুটে এসেছিল জয়বাংলার দামাল ছেলেদের হাতে রাখি পরিয়ে দিতে, ভাইফোঁটার রক্তিম তিলক পরিয়ে দিতে তাদের সৌম্য ললাটে।

জেনারেল অরোরার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংসদে কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা কখনো কোনো অবস্থায় ছোট হতাম না। ইতিহাসের মূল্যায়নের প্রশ্নে কোনো প্রকার কপটতা কিংবা কার্পণ্য করার অবকাশ নেই। আমরা পাকিস্তানী জেনারেল জানজুয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোকপ্রকাশ করেছি। যারা আমাদের ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম কলুষিত করেছে সেই হানাদার বাহিনীর জেনারেলদের প্রতি আমাদের দরদের ঘাটতি হয়নি। অথচ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মিত্রবাহিনীর প্রধান জে. অরোরার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ নিয়ে আমরা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছি। এহেন লুকোচুরি খেলা প্রকারান্তরে বীরের জাতি হিসাবে আমাদেরকে খাটো করেছে। জাতির সাথে এমন আত্মপ্রতারণা সংশ্লিষ্ট মহল না করলেও পারতেন।

যত দোষ নন্দ ঘোষঃ জামাত-বিএনপি'র ভারত ও আওয়ামী আতঙ্ক

আচমকা এক ঝড়ো হাওয়ায় তছনছ করে দিয়ে গেলো আমাদের সাজানো-গোছানো পোশাক শিল্পকে। এটা ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। তবে কোনোমতেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে অনেকটা 'বাইরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট' গোছের। বাইরে থেকে এই সেক্টরকে যতোই চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় মনে হয় এর ভিতরটা ততোই ফাঁকা। অসন্তোষ, অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা এই উদীয়মান পোশাক শিল্পকে সমস্যার গভীরে নিক্ষেপ করেছে। সাম্প্রতিককালে যা সংঘটিত হয়েছে তার পুরোটাই ছিল দীর্ঘ দিনের এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। এটা ছিল ঘটনা পরম্পরার অভিসম্ভাবী পরিণতি।

তবে খালেদা-নিজামী সরকার এই অমোঘ সত্যের দিকে এগুলো না। বিএনপি'র মহাসচিব কোন রাগ-ঢাক না করে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন গার্মেন্টস সেক্টরের এই সর্বনাশা খেলায় আওয়ামী লীগ 'বাতাস' দিয়েছে। এমন একটি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পিছনে আওয়ামী লীগের ইন্ধন থাকবে না, উস্কানি থাকবে না, মান্নান ভুঁইয়া সাহেবরা এটা কল্পনাও করতে পারেন না। খোদ বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন যে সকল মহল (ভারত) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি সহ্য করতে পারে না সেই সকল মহলই বাংলাদেশের বিকাশমান তৈরি পোশাক শিল্পকে ধ্বংস করতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ঐ সকল বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের এদেশীয় পদলেহী বংশবদগণ এই ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত। জামায়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে পোশাক শিল্পের এই ভয়াবহ অস্থিরতাকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' -এর কর্মকাণ্ড বলে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে

দিয়েছে। তাদের দাবিকে পাকাপোক্ত করার জন্য চলমান গার্মেন্টস অসন্তোষে জড়িত কিছু হিন্দু শ্রমিকের নাম উল্লেখপুর্বক এই ধ্বংসাত্মক কাজকে ভারতের ঈর্ষাকাতরপ্রসূত অপতৎপরতা বলে মন্তব্য করেছেন।

আমাদের জাতীয় জীবনের ট্রাজেডি এই যে, কোন সমস্যা উদ্ভব হলে কিংবা কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা আমাদের জাতীয় জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুললে আমরা সকলে মিলে তার কারণ অনুসন্ধান ও উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করার পরিবর্তে একে অপরের ওপর দোষারোপ ও মুণ্ডুপাত করতে থাকি। ফলে সমস্যা তিমিরেই থেকে যায় এবং জাতিকে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিক্ষেপ করে। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকদেরকে সর্বহারা বলে আখ্যায়িত করেছেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে সর্বহারা শ্রেণী তার জন্ম থেকে পুঁজিবাদী শিল্প মালিকদের সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামে নিয়োজিত। শ্রমিকদের এই শ্রেণী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করতে গিয়ে তারা লিখেছেন: সর্বহারা শ্রেণী তার বিকাশের নানা ধাপ পেরিয়ে এগোয়। শ্রেণীটি তার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। ব্যক্তি মালিকের সঙ্গে ব্যক্তি শ্রমিকের সংগ্রাম দিয়ে প্রক্রিয়াটি শুরু। পরবর্তী ধাপ হলো একজন মালিকের বিরুদ্ধে তার কারখানায় কর্মরত সকল শ্রমিকের সংগ্রাম। তারপর নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট বৃত্তিতে কর্মরত সকল শ্রমিকের সম্মিলিত সংগ্রাম চলতে থাকে তাদের প্রত্যক্ষভাবে শোষণকারী সকল বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে। এই সর্বহারারা শুধু বুর্জোয়া তৈরি উৎপাদন পরিবেশ ও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায় না, তারা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির ওপর হামলা চালায় ও আমদানি করা কলকব্জা ধ্বংস করে ফেলে। কারণ এগুলো তারা তাদের প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করে। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো তারা কারখানায় আগুন ধরিয়ে দেয়। (নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়ন ও জনমানুষের প্রতিরোধ, মাহবুব-উল-করিঃ পৃ-২৬)।

মার্কস এঙ্গেলসের এই উদ্ধৃতি পড়ে মনে হয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও তার আশপাশে সংঘটিত গার্মেন্টস শ্রমিকদের উন্মাদনা ও বিক্ষোভ প্রত্যক্ষ করেই সম্ভবত মার্কস-এঙ্গেলস এই মন্তব্য করতে উৎসাহিত হয়েছেন। কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের এই ধ্রুপদি তত্ত্ব সামনে রেখে আমরা যদি সম্প্রতি ঢাকা-গাজীপুর কিংবা সাভারের শ্রম-অসন্তোষ বিশ্লেষণ করি তবে অতি সহজেই বুঝতে পারবো এটা ছিল কেবলই শ্রমিকদের হৃদয়ের তীব্র ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া ও তাদের হৃদয় বন্দরে বহমান রক্তক্ষরণের বহিঃপ্রকাশ। এদিকে নজর না দিয়ে আমরা এ ঘটনার জন্য দায়ী করছি 'স্বার্থান্বেষী ভারতকে', 'সুযোগ সন্ধানী আওয়ামী লীগকে' কিংবা ক্ষেত্রেবিশেষে বিভিন্ন এনজিওকে।

তবে সংশ্লিষ্ট মহল নিজেরাই জানেন এটা কেবলই রাজনীতি। একেবারেই দুষ্টু রাজনীতি। তারা এটাও জানেন যে, আমরা গার্মেন্টস শিল্পে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করে যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারি এবং তার সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারি, তবে তার খেসারত শুধু বিএনপি-আওয়ামী লীগকেই বহন করতে হবে না, এর জন্য মূল্য দিতে হবে গোটা জাতিকে। আর ভারত আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী ও বন্ধু দেশ। কারণে-অকারণে ভারতকে আমাদের সবকিছুর মধ্যে টেনে আনা আমাদের শোভন নয়, উচিতও নয়।

আসল কথা যেকোন মূল্যেই আমাদের পোশাক শিল্পকে বাঁচাতে হবে। জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার অন্যকোনো পথ খোলা নেই। কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদেরকে এই শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। কারণ এটা অনস্বীকার্য যে, দেশের একদা নিষ্পেষিত নারী সমাজের ক্ষমতায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে গার্মেন্টস সেক্টর।

সম্প্রতি পোশাক শিল্পে যে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেলো তার অন্যতম কারণ ছিল অসংগঠিত, অজ্ঞ ও অন্ধ শ্রমিক নেতৃত্ব। আমাদের দেশে শ্রম আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। পাকিস্তানী আমলে পাঞ্জাবি শোষক চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের শ্রমিক সমাজ সফল নেতৃত্ব দিয়েছিল। ষাট-সত্তর দশক জুড়ে আমাদের শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে মার্কসীয় তত্ত্বেও বোদ্ধা দক্ষ দেশপ্রেমিক শ্রমিক নেতৃত্ব দ্বারা। এমনকি বাংলাদেশেও সামরিক শাসনের নিগড়ে থেকে আমাদের শ্রমিক নেতারা সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্কপ (শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ)-এর গৌরবদীপ্ত ও সফল আন্দোলনে এ দেশে অনেক শ্রমিক স্বার্থমুখী আইন প্রণীত হয়েছে। আমাদের শ্রম আইনসমূহ, তথা আইআরও এবং আইআরআর এখন পুরোটাই শ্রমিক স্বার্থমুখী। ২/১টি কালো অধ্যায় ছাড়া মালিকের পক্ষে খুব কমই আইন রয়েছে যতো না আছে শ্রমিকদের পক্ষে। তবে শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য তাদের পক্ষে আইনগুলোর সুফল তারা পাচ্ছে না। আইনি জটিলতা তথা আমাদের দেশের বিরাজমান ত্রুটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থার জন্য।

কিন্তু আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্পের অবস্থা ভিন্নতর। এখানে প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার মৌলিক অধিকার থেকে। মালিকরা তাদের স্বার্থ কুক্ষিগত করতে শ্রমিকদের বঞ্চিত করেছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দরকষাকষি করার সকল অধিকার থেকে। ফলে তাদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে কিংবা অধিকার রক্ষার নামে পোশাক শিল্পে উদ্ভব হয়েছে অসংসগঠিত

শ্রমিক আন্দোলন। আমরা জানি অন্ধের হাতে মশাল দিলে সে ঠিকই আলো জ্বালাবে, তবে একই সঙ্গে ঘরও পোড়াবে। অসংগঠিত, অনিয়ন্ত্রিত ও বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এই অন্ধের হাতে মশাল দেয়ার মতোই। তাদের হাতেই সাম্প্রতিক পোশাক শিল্পে এই মহাপ্রলয়কাণ্ড ঘটেছে। দেশ প্রেমিক, ত্যাগী ও পোড়খাওয়া শ্রমিক নেতৃত্ব গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করার সুযোগ পেতো তবে নিশ্চয়ই শ্রমিক আন্দোলনের নামে ২৩ মে-র ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ জাতিকে প্রত্যক্ষ করতে হতো না।

অতএব, আমরা যদি অতিদ্রুত এই শিল্পে আইনানুগ ও সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নের ধারা প্রবর্তন করতে না পারি তবে এই অন্ধ নেতৃত্ব আবার যেকোন সময় তাদের মশাল জ্বালিয়ে গোটা শিল্প পুড়ে ছারখার করে দিতে পারে। এই শিল্পে আইনানুগ ট্রেড ইউনিয়নকে নিরুৎসাহিত করা হয় বিধায় আমাদের বিবেকবান সুস্থ ও শিক্ষিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব সেখানে অনুপস্থিত। এই সুযোগে সেখানে গড়ে উঠেছে অসুস্থ নেতৃত্ব। পোশাক শিল্পকে ফিরিয়ে আনতে হবে বিবেকবান নেতৃত্বের কাছে। এর জন্য পোশাক শিল্পে জরুরি ভিত্তিতে চালু করতে হবে সুস্থ ধারার ট্রেড ইউনিয়ন। এ প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলসের কথা আবার স্মরণ করতে হবে, পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে, তাদের ঐক্য ব্যাপকতর হয় এবং তাদের শক্তি বেড়ে যায়। তারা নিজেদের শক্তিমত্তাকে বেশি করে অনুভব করতে থাকে। কিন্তু এ পর্যায়ে শ্রমিকরা বিচ্ছিন্নভাবে তাদের সংগ্রামে বিজয়ী হলেও সেগুলো সাময়িক ফল বয়ে আনে মাত্র। তাদের সংগ্রামের প্রকৃত ফল এসব বিক্ষিপ্ত বিজয় অর্জনের মধ্যে নয়, তা নিহিত থাকে তাদের সদাবিকাশমান ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে।' অতএব, পোশাক শিল্পের মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থেই এই মুহূর্তে প্রয়াজন সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন ধারা প্রবর্তন করে সকল সমস্যা ও দ্বন্দ্বের অবসান করা। এবং একই সাথে প্রয়োজন যেকোন ঘটনার জন্য ভারতকে দায়ী করা কিংবা আওয়ামীবিরোধী প্রচারণা থেকে বিরত থাকা।

অপরের বিবস্ত্র ছবি ছেপে নিজেদের নগ্নতা ঢাকা যায় না

একানব্বই-এর নির্বাচনে আচমকা বিজয় লাভের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করে। সাথে সাথে পাল্টে যায় বিএনপির লড়াকু চরিত্র। আওয়ামী লীগের সাথে একাট্টা হয়ে দীর্ঘদিন বিএনপি এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছে। রাজপথে মিটিং মিছিল ও লাগাতার হরতালও করেছে দেদার। অবশ্য এরশাদ সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সংবাদপত্রের উপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করে। ওই নিষেধাজ্ঞার আওতায় সংবাদপত্রগুলোকে হরতাল লিখতে দেয়া হতো না। তবে সাংবাদিকরা বসে ছিলেন না। নতুন শব্দ রচনা করে তাদের কাজ চালিয়ে যেতেন। হরতালের পরিবর্তে লেখা হত 'কর্মসূচি'। যেমন– এরশাদ বিরোধী আন্দোলনেরত বিরোধীদল যখন তিনদিন লাগাতার হরতাল ঘোষণা করত তখন সংবাদপত্রে লেখা হতো 'তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে'। আবার লেখা হত অমুক তারিখ হতে দেশব্যাপী লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। যাইহোক এরশাদের পতন ঘটাতে বাঘে মহিষে যুদ্ধ করতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যত ধরনের আন্দোলন করা সম্ভব সবকিছুই এস্তেমাল করতে হয়েছে এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে। এরশাদের পতনের পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় 'সূক্ষ্ম কারচুপির জোরে' বিএনপি এক অচিন্ত্যনীয় বিজয় লাভ করে। কিন্তু সরকার গঠনের সাথে সাথে দেশে ডান্ডাতন্ত্র কায়েম করা হয়। গণতন্ত্র চলে যায় নির্বাসনে। গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে আবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় সমমনা রাজনৈতিক দল নিয়ে বিরোধীদলীয় জোট। একদিকে শুরু হয় আন্দোলন, অপরদিকে চলতে থাকে গণতান্ত্রিক লেবাসে চরম স্বৈরশাসন। দেশের সাধারণ মানুষের উপর নেমে আসে অত্যাচারের স্টিম রোলার।

এমনি এক বিক্ষোভকালীন পরিবেশে বিরোধীদল আহূত হরতালের সময় শাহবাগ মোড়ে একজন পথচারীকে বিবস্ত্র করা হয়। বিষয়টি অভূতপূর্ব না হলেও সঙ্গত কারণেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল দিন কয়েক আগে। এ জাতীয় ঘটনা শুধু

নিন্দনীয়ই নয়, অশোভন, অমানবিক এবং সভ্যতাবর্জিতও বটে। এ ঘটনার যারা হোতা তাদের মন ও মননশীলতা, শিষ্টাচার ও নীতিবোধ এমনকি রুচি ও কাণ্ডজ্ঞান সবকিছুই প্রশ্নের মুখোমুখি।

ষাটের দশকে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন বায়তুল মোকাররম-এর সামনে উত্তেজিত ও আন্দোলনমুখর জনতা কয়েকটি ইপিআরটিসি'র (বর্তমানে বিআরটিসি) বাস পুড়িয়ে দেয়। জনতার রোষে সম্পূর্ণ কোণঠাসা মুসলিম লীগারগণ একে একটি আচমকা মওকা হিসাবে পেয়ে সেটাকে আন্দোলনের নামে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বলে বিরোধী দলকে গালমন্দ করা শুরু করল। দৈনিক ইত্তেফাক সেই বাস পোড়ানোর ছবির নিচে ক্যাপশনে লিখেছিল, "জনতার রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত ইপিআরটিসির বাস"। জনতার রোষাগ্নিতে এই একটিমাত্র কথার মাধ্যমেই ইত্তেফাক মুসলিম লীগারদের বগল বাজানোর যুৎসই জবাব দিয়েছিল। জনতা কোন কারণে রুষ্ট হলে শুধু বাস নয়, বিচারালয় পর্যন্ত পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে উত্তেজিত জনতা ক্ষেপে গিয়ে বিশেষ বিচারালয়টি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আর বঙ্গবন্ধুর বিচার করতে আসা জজ সাহেব শেষ পর্যন্ত তার গৃহভৃত্যের পোশাক পরে পালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিল। জনতার রোষাগ্নিতে পড়লে কখন যে কী হয় আইয়ুব-ইয়াহিয়ারা তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে।

তবে সম্প্রতি বিবস্ত্র হওয়া কিংবা বিবস্ত্র করানোর ঘটনার সাথে জনরোষ কতটুকু কাজ করেছে সেটা বিতর্কিত বিষয়। বিভিন্ন মহল বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করছে।

এই ঘটনার যিনি ভিকটিম তার দিকে একটু তাকানো যাক। ভদ্রলোক কোথায় চাকরি করে, কোন কারণে হরতাল উপেক্ষা করে শাহবাগের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিংবা কোন মহল তাকে সত্যি সত্যিই এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছিল কিনা, ফটোগ্রাফারদের আগাম খবর দিয়ে জড়ো করানো হয়েছিল কিনা কিংবা কেউ ছবি তুলে বিভিন্ন পত্রিকা ও স্থানে সরবরাহ করেছিল কিনা, এ ঘটনা ঘটাবার জন্য কোন মহল থেকে কাউকে মদদ জুগিয়েছিল কিনা কিংবা প্রলোভনের ফাঁদে ফেলেছিল কিনা? একই ব্যক্তি একাধিক জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করে নিজে ধরা পড়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুলিশের নাকের ডগায় ঘোরাফেরা করছিল কিনা, একটি নিরীহ মানুষ যখন লাঞ্ছিত হচ্ছিল তখন নিকটে কর্তব্যরত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের অনুগত বাহিনীর মতো কাঠের পুতুল হয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে ছিল কিনা? এসব প্রশ্ন যদি মন থেকে ঝাঁটা মেরে দূর করে দেয়া হয় তারপরও প্রশ্ন থাকে। কথা থেকে যায় যারা বিবস্ত্র ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত করেছে তাদেরকে নিয়ে। সেই লোকটির ছেলে-

মেয়ে-স্ত্রী-পরিজন-বন্ধুমহল- চেনাজানা লোকেরা তার বিবস্ত্র ছবিটি দেখেছে। একথা মনে করে উক্ত ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই লাজ-লুণ্ঠিত হয়েছে এবং ম্রিয়মাণ হয়েছে। যদি ব্যক্তিটি সত্যি সত্যিই নির্দোষ ও সহজ-সরল প্রকৃতির হয় এবং যদি সে কোন মহলের পিকড্-আপ না হয় তবে তার মতো হতভাগা দুঃখী ও ব্যথিত মানুষ বাংলাদেশে আর মনে হয় কেউ নেই।

আজ যারা শাহবাগ মোড়ের ভিকটিম লোকটির বিবস্ত্র ছবি রঙিন পোস্টার করে ছাপিয়ে দেশময় বিলি করে বেড়াচ্ছে তারা কী চাচ্ছে? আসলে যারা পোস্টার সাঁটায় নেমেছে তারা চতুর বণিক। তারা ব্যবসায় নেমেছে বিনা পুঁজিতে। তাদের একমাত্র মূলধন শাহবাগ মোড়ের হতভাগ্য মানুষটি ও তার লজ্জা, দুঃখ ও ক্ষোভ। মানুষের দুঃখ নিয়ে, লজ্জা নিয়ে যারা ব্যবসা করে, রাজনীতি করে, তারা শৌর্য-বীর্যশালী নয়। তারা কাপুরুষ।

গায়ের জোরে যারা যত বড় কথাই বলুক এদেশের জনগণই বড় বিচারক। যারা একজন নিরীহ মানুষকে বিবস্ত্র করতে পারে, জনতার আদালতে তাদের একদিন দাঁড়াতেই হবে। জনগণের সুকঠিন সওয়ালের জবাব তাদের দিতেই হবে। কোন অন্যায়ই গণআদালতের কঠিন প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারবে না। যারা কষ্টার্জিত গণতন্ত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, ঘৃণ্য দলীয়করণ নীতির হিংস্র ছোবলে সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান একের পর এক ধ্বংস করে চলছে, সার চাইতে গেলে কৃষকদের বুকে গুলি চালাচ্ছে, বিশ টাকা চাল আর পঞ্চাশ টাকা সেরে ডাল দিয়ে মানুষের ডাল-ভাত খাওয়ার স্বপ্ন দিচ্ছে চুরমার করে, প্রেসক্লাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেড় শতাধিক সাংবাদিককে লাঞ্ছিতকারীদের তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কৃত করে, দিনাজপুরের হতভাগ্য ইয়াসমিনের ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধের বিচার প্রার্থীদের যারা দুস্কৃতকারী বলে আখ্যায়িত করে, ভোটের নামে করে ডাকাতি, শিক্ষার পরিবর্তে মদদ যোগায় সন্ত্রাসবাদের। তাদের সকলকে একদিন জনগণের কাঠগড়ায় আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে। সেদিন যদি গণআদালতে পার পেতে হয় তবে নিজেদের ভূমিকা বদল করতে হবে। অপরের দোষ দেখিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা যাবে না। গণআদালতের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী পার হতে চাইলে সকলকে আবেগ ও অহমিকা বর্জন করতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে ন্যায়-নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। উলঙ্গ মানুষের ছবি ছাপিয়ে নিজেদের নগ্নতা ঢাকা যাবে না। এটা সংশ্লিষ্ট মহল যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে তাদের জন্য ততই মঙ্গলকর। জাতির জন্যও এটা হবে অধিকতর কল্যাণকর ও কাঙ্ক্ষিত।

পদ তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করলেন

ছিয়ানব্বই-এর বিস্ফোরন্মুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের পদভরে প্রকম্পিত বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বর। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমদ গত ২৪ আগস্ট পদত্যাগ করেন। ৩১ আগস্ট নব নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহম্মদকে তিনি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। "বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা ও পরিবেশ পরিস্থিতির অবনতি ঘটা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে" অভিযোগ এনে মান্যবর উপাচার্য মহোদয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে পদত্যাগ করলেন। দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার প্রাক্কালে উপস্থিত সাংবাদিকদের আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন, 'আমি আর পারছি না।'

আসলে কোন প্রতিষ্ঠানে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জানমালের নিরাপত্তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠান প্রধানের আয়ত্তের বাইরে তখন প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদত্যাগ করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রতি যারা সজাগ ও শ্রদ্ধাশীল তারা সবসময়ই সকল প্রকার গ্লানি ও ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে পদত্যাগ করেন প্রতিষ্ঠানের সুনাম, সুখ্যাতি ও ভাবমূর্তি রক্ষাকল্পে। এমনকি অনেক মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীও নিজ নিজ দপ্তর ও সরকারের ব্যর্থতাকে নিজ কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করে বরণীয় হয়েছেন এমন অসংখ্য নজিরও আমাদের সামনে রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ভাবা যেত, বিশ্লেষণ করা যেত তবে ভিসি মহোদয়ের পদত্যাগ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখত। কিন্তু না, ভিসি সাহেবের এই নাটকীয় পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রসূত নয়। বরং মাননীয় ভিসি মহোদয় সরলতার ছদ্মাবরণে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। তার পদত্যাগ নাটকের আড়ালে রয়েছে রাজনীতির এক নগ্ন চাল, চাতুর্যপূর্ণ রাজনীতির খেলা।

মাননীয় উপাচার্য এমাজউদ্দিন আহমদের চার বছরের দায়িত্বকালে বিশ্ববিদ্যালয় ন'জন

ছাত্রকে প্রাণ হারাতে হয়েছে ক্যাম্পাসেই। গ্রামবাংলার সহজ-সরল মানুষ হেমন্তের ফসলের মাঠের মতো একবুক আশার স্বপ্ন নিয়ে তাদের প্রিয় সন্তানদের পাঠিয়েছিল উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের হেফাজতে। উপাচার্য মহোদয় সেই মা-বাপের কোলে তাদের প্রিয় সন্তানদের রক্তলাল লাশ ফিরিয়ে দিয়েছেন এক এক করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘাতকরা ছিল চিহ্নিত। একবার দু'বার নয়- ন'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গন রক্তে লাল হয়েছে। কালো পিস্তলের থাবার নিচে মুখথুবড়ে পড়েছে সভ্যতা। ঘাতকদের হিংস্র থাবার নিচে থমকে দাঁড়িয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য। সমগ্র জাতি ক্ষোভে-দুঃখে-বেদনায় হয়েছে বাকরুদ্ধ, বিহ্বল। শুধু নাড়া দেয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এমাজউদ্দিন সাহেবের হৃদয়। ন'টা তাজা তরুণ প্রাণের মৃত্যু তার হৃদয়ে কোন প্রকার দাগ কাটতে পারেনি। কিংবা তার বিবেককেও সামান্যতম নাড়া দিতে সক্ষম হয়নি। এর অকাট্য প্রমাণ- এতগুলো মৃত্যুর পরও এমাজউদ্দিন সাহেব কখনও পতদত্যাগ করার কথা ভাবার অবকাশ পাননি। প্রয়োজনও বোধ করেননি। সন্তানতুল্য ন'টি ছাত্রের লাশ ও তার পাপবোধকে সযত্নে লালন করে হাসিমুখে শাসকচক্রের উমেদারি করেছেন। ক্ষমতাসীনদের করুণা-কৃপায় নিজেকে করেছেন ধন্য।

হত্যাকাণ্ড ছাড়াও অনেক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্বিবিদ্যালয়ে তথা অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের কার্যকালে। গত বছর খালেদা জিয়ার বাংলা একাডেমীতে আগমনকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী জগন্নাথ হলে সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। কেবলমাত্র জন্মসূত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায়, স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও মানবাধিকার বিরুদ্ধ ঘৃণ্যতম আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে নির্দোষ ছাত্রদের। কোমরে রশি বেঁধে জেলে নেয়া হয়েছে, রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে মেরুদণ্ড, কোমর, পায়ের নালা ভেঙে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দরজা-জানালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্রদের প্রহার করে অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছে, রুমে টানানো দেব-দেবীর ছবি ভেঙে পদদলিত করা হয়েছে, টাকা-কড়ি লুটপাট করা হয়েছে। এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়, গোটা জাতি এমনকি বিদেশী দূতাবাসের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রধানদের মাঝে দারুণভাবে আলোড়িত করেছে যে সকলেই ছুটে এসেছিলেন জগন্নাথ হলে- নিগৃহীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য এবং এহেন মানবতা বিরোধী ঘটনার নিন্দা জানানোর জন্য।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, আজ পর্যন্ত অধ্যাপক এমাজউদ্দিন জগন্নাথ হলটি দেখতে যাননি। অথচ এই বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে প্রথমেই উচিত ছিল উপাচার্যের পদ থেকে তার পদত্যাগ করা। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং বিশেষ কারণে সেদিন তিনি বেদনার্ত না হয়ে আনন্দিত ও আহ্লাদিত হয়েছিলেন।

আরো আগের কথা। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন তখন প্রো-ভিসি, ডাকসু'র নির্বাচনে তাদের সোনার ছেলেরা পরাজিত হলে পরদিন প্রতিপক্ষের বিজয় মিছিলে হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা মেয়েদের ওড়না কেড়ে নেয়, শাড়ি টানাটানি করে এবং এক পর্যায়ে অসংখ্য মেয়ের চুল টেনে মাটিতে ধরাশায়ী করে সোল্লাসে অপদস্থ করে। গোটা জাতি সেদিন কষ্ট আর বেদনায় ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের উর্বর বিবেকের উপাদানগুলো এমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি বুঝতেই পারেননি যে এই ঘটনার জন্য তার পদত্যাগ করা উচিত। বরং সেদিন প্রো-ভিসি থেকে ভিসির সিংহাসনটি দখল করার লোভে তিনি ওই পৈশাচিক আক্রমণকে বাহবা দিয়েছিলেন। তবে অনেক দেরিতে হলেও অধ্যাপক এমাজউদ্দিন সাহেবের ঘুমিয়ে থাকা বিবেক জেগে উঠেছে!

অতঃপর সবকিছুর যেমন শুরু আছে, তেমন শেষও আছে। অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের বেলায়ও তাই ঘটলো। তার ইনিংস প্রায় শেষের দিকে। দু'মাস পরেই সিংহাসন ছাড়তে হবে। ভিসি পদে আবার নির্বাচিত হতে তাকে সিনেটের সদস্যের ভোটে জয়ী হতে হবে। সিনেটের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি হিসেবে ২৫ জন সিনেট সদস্যের সব ক'জনই নির্বাচিত হয়েছেন তার প্রতিপক্ষ প্যানেল থেকে। ৩৫ জন বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষক প্রতিনিধির অধিকাংশই তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের। সংসদ সদস্য, গবেষক, চ্যান্সেলরের নমিনীসহ সকল মনোনীত সদস্য আসছেন তার উল্টো স্রোতধারা থেকে। অতএব সিনেটের নির্বাচনী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার ন্যূনতম সম্ভাবনাও নেই অধ্যাপক এমাজউদ্দিন সাহেবের। অন্যদিকে গোদের ওপর বিষফোঁড়া।

কিন্তু কম্বল ছেড়ে দিলেও কোন কোন সময় কম্বল ছাড়তে চায় না, বরং আরও জোরালোভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চায়। মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের পদত্যাগের প্রশ্নে বলতে গিয়ে মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এমাজউদ্দিন সাহেবের পদত্যাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক মঙ্গল বয়ে আনবে। সে যাই হোক, ভিসি মহোদয়ের পদত্যাগের ফলে কী কল্যাণ হবে এটা সময় বলে দেবে। বাস্তবতা কিন্তু ভিন্নতর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার সুরের মত 'ধ্বনি দিলে প্রতিধ্বনি মেলে'। বর্তমানের মূলসুর যা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল থেকে দেয়ালে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তা ভিসি মহোদয়ের পদত্যাগ পর্ব নয়, ভিসি মহোদয়ের দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতির বিষয়টি। পদত্যাগ করলেই আমলনামা পরিষ্কার হয়ে যাবে? তার কৃতকর্মের কোন জবাব কি তিনি দেবেন না? বিশ্ববিদ্যালয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমে থাকা অনিয়ম ও দুর্নীতির এক ভয়াবহ চিত্র সমগ্র জাতির কাছে আজ ভেসে উঠতে শুরু করেছে। এমনকি ভিসি সাহেবের মেয়ে ও জামাতার নিয়োগ-পদোন্নতি নিয়েও অভাবনীয় অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ভিসির জামাতা মি. আতিকুর রহমানের 'Institute of Social Welfare and Research (ISWR)- এর Associate Professor হিসেবে নিয়োগের

অনিয়মটিসহ অন্যান্য অনিয়ম তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি এক-সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। অধ্যাপক এম. জেড. মোস্তফা কর্তৃক প্রণীত চার পৃষ্ঠার রিপোর্টটি শুরু হয় এইভাবে, "There has been allegations of blatant nepotism and gross irregularities in the recent appointment of Associate professors at the ISWR. Complaints were lodged with the Ministry of Education and the Ministry asked the UGC to conduct an inquiry into the matter. Against this backdrop, the present inquiring was undertaken.

এই তদন্ত কমিটি উদ্‌ঘাটন করেন ভিসি সাহেব তার জামাতাকে নিয়োগ করার নিমিত্তে Associate Professor নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার দু'বছর তিন মাস পরে সিলেকশন কমিটির সভা আহ্বান করেন। (বিজ্ঞাপনের ছয় মাসের মধ্যে নিয়োগ দেয়ার বিধান রয়েছে) কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে, "There was inordinate delay in convening the meeting of the selection committee. Two years and three months had elapsed before the selection committee met to consider the applications. Such a state of affairs is simply preposterous. This delay enabled at least one candidate to come closer to satisfying the minimum requirements in respect of experience set for the post" এই at least one candidate" হলেন ভিসি মহোদয়ের সৌভাগ্যবান জামাতা। অন্তত সাত বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে Associate Professor হওয়ার বিধান নেই। তাই বিজ্ঞাপন দেয়ার পর সোয়া দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে selection committee সভা ডাকতে।

"As another spin-off of the delay a candidate without a research degree and with only 7 years experience got the same treatment as a Ph. D. candidate with 24 years experiences. Both of them were appointed Associate Prfessor on the same date with equal pay."

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। সিলেকশন কমিটির প্রথম সভায় ভিসি মহোদয় থাকলেন না এই বলে যে, এখানে তার জামাতা একজন প্রার্থী। তার অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক কে. টি হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিলেকশন কমিটির সভায় পাঁচজনকে মনোনীত করলেন। দুর্ভাগ্যজনক এই যে, ভিসি জামাতা বাদ পড়লেন সিলেকশন থেকে। তাই ISWR- এর Board of governors (যার চেয়ারম্যান স্বয়ং ভিসি) এই পুরো সিলেকশন অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য সিলেকশন কমিটিতে ফেরত পাঠালেন। এবার ঘটল দু'টি মজার ঘটনা। ভিসি সাহেব সিলেকশন কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকলেন। কিন্তু প্রথম সভার সভাপতি অধ্যাপক কে. টি. হোসেন সভায় রইলেন অনুপস্থিত।

এই সভায় মাত্র তিনটি Advertised Posts-এর বিপরীতে মোট সাতজন প্রার্থীর

সকলকেই (ভিসি-র জামাতাসহ) গণ-প্রমোশন দেয়া হল। তদন্ত কমিটিকে বলা হয়েছে- "It may be pointed out in this context that all the candidates with the lone exception of Mr. Atiqur Rahman appeared for interview. He did not ask for an exception for this purpose, nor is it usual to grant such an exception."

ভাইস চ্যান্সেলর-এর সভায় উপস্থিতি সম্পর্কে UGC-র তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, "The Vice-chancellor attended the second meeting of the SC held on 15-11-93. This meeting lasted 5 hours and it is reported that the V.C. was in the meeting all throughout. He guided the deliberations and dictated the decisions of the committee. However, mysteriously enough, the V.Cs name does not appear in the proceeding of the meeting.

এটা আজ পরিষ্কার উপাচার্য মহোদয়ের ২৪ আগস্টের পদত্যাগ বিবেকতাড়িত নয়, রাজনীতিতাড়িত আত্মীয়করণ। কোন প্রকার রাজনীতি, শিষ্টাচার কিংবা শোভনতা থেকে এমাজউদ্দিন সাহেব পদত্যাগ করেননি, তিনি ইস্তফা দিয়েছেন নিজের অতীত কর্মকাণ্ডকে আড়াল করতে।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় পদত্যাগ করে পদকে বাঁচালেন। ২৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক'টি তাজা প্রাণ ঝরে পড়েছিল? কত রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল কার্জন হল কিংবা কলাভবনের মুখরিত প্রাঙ্গণ? কী ভয়াবহ পরিস্থিতির ভূত দেখলেন ভিসি মহোদয়, যাঁর জন্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল? একমাত্র পুনর্বার ভিসি নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি ছাড়া বাকি সবকিছুই তো ছিল আপনার পূর্ণনিয়ন্ত্রণে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে আপনাকে তো কষ্ট করে পদত্যাগ করতে হত না। সময় এসেছিল পদই আপনাকে ছেড়ে যেত।

গোলাম আযমের পদত্যাগ না ভিন্নতর কূটকৌশল?

গোলাম আযম পদত্যাগ করেছেন। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী এই গোলামের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। গত প্রায় দুই দশক তিনি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ছিলেন। কখনও প্রকাশ্যে আবার কখনও বা পর্দার আড়ালে। তার পদত্যাগ জাতীয় জীবনে কোন গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু যে নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে তা অনেকেরই দৃষ্টি কেড়েছে। এক বিবৃতিতে তিনি পদত্যাগের দাবি করলেও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় তাকে মূলত পদচ্যুত করা হয়েছে। ঘটনা যাই হোক আসল সত্য হচ্ছে তিনি আর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর নন। এটা ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি। তার বিরুদ্ধে দল ও জোটের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা আঁচ করে চতুর গোলাম আযম এই ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেন। তাই স্বাস্থ্যগত কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে পদত্যাগ করেছেন বলে যে দাবি করা হয়েছে তাকে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

এমন সময় তিনি পদত্যাগ করলেন যখন বলা হচ্ছে, বিএনপি-জাপার সঙ্গে একাট্টা হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে কুপোকাৎ করার চূড়ান্ত মুহূর্ত সমাগত এবং জোট নেতৃত্ব আর মাত্র 'একটি ধাক্কার' পরই ক্ষমতার মসনদে পৌঁছে যাবে। তাহলে কেন এই পদত্যাগ? আসলে গোলাম আযমের পদত্যাগের কারণ একটিই এবং তা একেবারেই সরল ও স্বাভাবিক। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ-লসাগু-গসাগু যাই করুন না কেন দেখা যাবে এর পেছনে একটি রাজনৈতিক চালবাজিই বিদ্যমান। আর তা হল পাকিস্তানী হানাদার বাহি-নীর দোসর, এ দেশের অগণিত মানুষ হত্যা, লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, এক কোটি মানুষকে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাতের অপবাদ এবং স্বাধীনতার শত্রু ও যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চার দলীয় জোটের যে পরিচিতি আজ স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে তার কলঙ্ক-কালিমা কিছুটা হলেও মুছে ফেলার জন্যই এই সাজানো পদত্যাগ নাটকের অবতারণা করা হয়েছে। এর প্রমাণ অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গোলাম আযম ঘোষণা দিয়েছেন, 'দলীয় প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেও জামায়াত ছাড়িনি, রাজনীতিও ছাড়িনি।' তাহলে তিনি ছাড়লেনটা কী? ছাড়লেন চার দলীয় জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব, ছাড়লেন জোটের মঞ্চ। কারণ একই মঞ্চে খালেদা জিয়ার পাশে তাকে আসন নিতে দেখে কেবল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশবাসীই ক্ষুব্ধ হয়নি বরং খোদ বিএনপি ও জাপার বৃহত্তর অংশ ঘৃণায় ফেটে পড়েছে। বিশেষ করে গোলাম আযমকে নিয়ে গঠিত বিরোধী জোটের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতাকামী ও মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী আপামর জনগণ 'মুক্তিযোদ্ধা-জনতা' ব্যানারে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে তাতে জোট নেতৃত্ব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদেই জোটকে গোলাম আযমমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত গোপন নীল-নকশা এঁকে কেবল নির্বাচন পর্যন্ত গোলাম আযমকে চার দলীয় মঞ্চ থেকে দূরে রাখার কৌশল হিসাবে তারা তাকে পদত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য করেন। নির্বাচনে সুফল পাওয়া গেলে গোলাম আযম আবার তসরিফ আনবেন, উজির হবেন এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবেন।

তবে গোলাম আযমকে সাময়িকভাবে মঞ্চ থেকে দূরে এবং একই সঙ্গে জামায়াতকে অন্যতম শরিক দল রেখে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী নয় বলে প্রচারণা চালিয়ে কতটুকু সফল হবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোলাম আযমের আসনে কাকে বসিয়ে জোট জনগণকে খুশি করবেন। নিজামী সাহেবকে না অন্য কাউকে? জামায়াতের মধ্য থেকে গোলাম আযমকে আড়াল করে ক্লিন মুখ খোঁজার বিরোধী দলীয় এই প্রয়াস কেবল হাস্যকরই নয় প্রতারণা ও চাতুর্যপূর্ণও বটে।

তবে আসল কথা গোলাম আযম কেবল জামায়াত কিংবা চার দলীয় ঐক্যজোটের জন্যই আপদ নয়। গোটা জাতির কলঙ্ক। জাতিকে এই ঘোরকলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হলে অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচার হওয়া উচিত, তাকে ফাঁসিতে লটকানো উচিত।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আয়োজিত মানবাধিকার সংক্রান্ত এক সেমিনারে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও আইনজীবীগণ ছাড়াও দেশ-বিদেশ থেকে আগত আইন বিশেষজ্ঞ ও মানবতাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বার কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি ও এটর্নি জেনারেল প্রয়াত আমিনুল

হক বলেছিলেন, 'In this part of land there was never any violation of state organized human rights unless and untill President Yahyia Khan denied to hand-over power to the elected represantatives of the people' (নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খানের অস্বীকৃতির পূর্ব মুহূর্তে এ দেশে কোন সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হয়নি)। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে আমিনুল হক আরও বলেছিলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরিবর্তে ইয়াহিয়া চক্র এদেশে নজিরবিহীন ও বিভিষীকাময় গণহত্যা চালিয়েছে। একই সঙ্গে চলেছে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও মা-বোনদের পবিত্র সম্ভ্রম লুণ্ঠন।

দুঃখ করে আমিনুল হক বলেছিলেন, 'জাতির এই চরম দুঃসময়ে এদেশেরই কিছু কুলাঙ্গার ও দেশদ্রোহী অতি উৎফুল্ল ও সানন্দচিত্তে পাক-হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছিলেন হত্যা, লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণে। এরপর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। তার দু'চোখ ছলছল করে উঠল। অত্যন্ত কাছ থেকে দেখলাম, আপোষহীন মানবতাবাদী এই শীর্ণকায় মানুষটি হঠাৎ সুবিশাল পর্বতের মতো মাথা উঁচু করে শাহাদাত আঙুল হেলিয়ে আমাদের শ্বেত-শুভ্র সুপ্রিম কোর্ট ভবনটির প্রতি ইঙ্গিত করে দৃঢ়চিত্তে উচ্চারণ করলেন, "Our this court is so generous that is had accomodated a war criminal by giving verdict" (আমাদের আদালত এতই উদার যে, একজন যুদ্ধ অপরাধীর পক্ষে রায় দিয়ে তাকে সমাজে পুনর্বাসিত করেছে)। উত্তেজনায়, ক্ষোভ ও ঘৃণায় আমিনুল হক কাঁপছিলেন। তিনি কথাগুলো বলেছিলেন জঘন্য যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে ইঙ্গিত করে। দীর্ঘদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন আমিনুল হক। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ও আইনের ফাঁক-ফোকর গলে গোলাম আযম বের হয়ে এসেছে। এর পর বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে খালাস পেলেও গোলাম আযম জনতার আদালত থেকে মুক্তি পায়নি। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত গণআদালতের বিচারে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া বাংলার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পাগল মানুষের ঘৃণা ও রোষাণল থেকে গোলাম আযম কখনও নিস্তার পায়নি। দলীয় প্রধানের পদ থেকে অপসারিত হল, জনতার আদালতই সবচেয়ে বড়। জনতার বিচার সর্বোচ্চ এবং একই সঙ্গে প্রমাণিত হল, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সম্পর্কহীন, মিলনহীন কোনও কিছু কিংবা কোনও মানুষই টিকতে পারে না।

জনগণ প্রকাশ্যে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে এই কুখ্যাত ও গণধিকৃত ব্যক্তিটির মঞ্চে

উপস্থিতির বিরুদ্ধে। চার দলীয় জোট নেতৃবৃন্দ ও নীতিনির্ধারকগণ বুঝে ফেলেছেন, গোলাম আযম অখাদ্য। একে খাওয়ানো যাবে না। বরং নিজেরাই একে নিয়ে বদহজমের সম্মুখীন হবেন। তাই বলে বহু ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অগ্নি শপথের বিপ্লবী বাক্য উচ্চারণ করার পর এত তাড়াতাড়ি জামায়াতকে জোট থেকে বহিষ্কার করা হলে তা জোটের জন্য রাজনৈতিক কলঙ্কের অধ্যায় সূচনা করবে। এ কারণে কৌশল অবলম্বন করে গোলাম আযমকে বাদ দিয়ে বিরোধী জোট প্রমাণ করতে চাইছে তাদের সঙ্গে স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী নেই।

আসলে এ ধরনের নেতৃবৃন্দ উন্মাদের কারাগারে অবস্থান করছেন। গায়ে গেরুয়া বসন থাকলেও বোষ্ঠমির ঝোলার মধ্যে যে গোমাংস তা কিন্তু জনগণ দেখে ফেলেছে। জামায়াত মাইনাস গোলাম আজম কি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে? গোলাম আযমের পদত্যাগের মাধ্যমে এটা কি প্রমাণিত হবে যে, রাতারাতি জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হয়ে গেছে? না, এটা কখনও কোনওভাবেই সম্ভব হবে না। ৬৪ হাজার গ্রাম থেকে এক কোটিরও বেশি লোককে তাড়িয়ে দিয়ে ৩০ লাখ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, দু'লাখ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনের নিঃশর্ত সমর্থন যোগানোর মাধ্যমে গোলাম আযম ও তার সহযোগীরা কলঙ্কের কালিমা নিজেদের ললাটে ধারণ করেছে। জাতির কাছে ওই কলঙ্কের তিলক অগণিত কাল ধরে জ্বল জ্বল করতে থাকবে। কিন্তু গোলাম আযম হঠাৎ করে পদত্যাগ করতে গেলেন কেন? আসলে তিনি পদত্যাগই করতে পারেননি। মূলত দলীয় নেতৃত্ব হতে অপসারিত হয়েছেন। এই বিতর্কিত গণবিরোধী ব্যক্তিটি শুধু জাতির কাছে নিন্দিত নয়, দলের জন্যও বোঝাস্বরূপ। এই লোকটি যখন দলের নেতৃত্বে ছিল না তখন দল ১৮/২০টি আসন পেয়েছে। আর যখন দল তার নেতৃত্বাধীন তখন আসন সংখ্যা দু'টি। নিজেও দাঁড়াতে সাহস করেনি কোন আসনে।

যে মুহূর্তে গোলাম আযম বিএনপি-জাপার সঙ্গে চার দলীয় ঐক্যজোট গঠন করে রাজনীতিতে কথিত তেজীভাব সৃষ্টি করলেন, বিভিন্ন সভা-সমাবেশে জোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসাবে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং অতি শিগগিরই একটি ধাক্কা মেরে শেখ হাসিনার সরকারকে চিৎপটাং করে ক্ষমতার মসনদে বসে শ্বেত-শুভ্র শ্মশ্রুতে হাত বুলাবে, উজির-নাজির হবেন সেই মুহূর্তে হঠাৎ এই পদত্যাগের হেতু কি?

এই পদত্যাগ নাটকের পিছনে একটি মাত্র শক্তি কাজ করেছে- জনগণের ঘৃণা, তীব্র ঘৃণা! দেশের যে অঞ্চলেই চার দলীয় শীর্ষ নেতাদের সমাবেশ ঘটেছে, যখনই গোলাম আযম মঞ্চে তসরিফ নিয়েছেন তখনই মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে, প্রচণ্ড ক্ষোভের

সঞ্চার হয়েছে।

দেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করার অপরাধে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করেছিল জাতির জনকের নেতৃত্বাধীন সরকার। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের কালো রাতে জাতির জনককে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পূর্ব পর্যন্ত গোলাম আযম পাকিস্তানে ছিলেন এবং মুসলিম বিশ্ব তথা সারাবিশ্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শুধু বিষোদগার করেই ক্ষান্ত হননি, সদ্য স্বাধীন দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার সক্রিয় চক্রান্তে জড়িত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর মুক্তিযোদ্ধা নামধারী জিয়াউর রহমান তার পাক-প্রভুদের খুশি করার জন্য গোলাম আযমকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনেন এবং খালেদা জিয়ার শাসনামলে লোক দেখানো একটি মামলার মধ্য দিয়ে গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেন। অবশ্য, এটা ছিল বেগম জিয়ার কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচায়ক একটি মনোরম দৃষ্টান্ত। '৯১-এর জাতীয় নির্বাচনে 'সূক্ষ' কারচুপির মাধ্যমে এবং নিজেদের নাক কেটে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে বিএনপিকে জিতিয়ে দেয়ার ইনামস্বরূপ খালেদা জিয়া গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শেষতক বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি উভয়েই যখন নিজেদের 'কুতুর বল' দিয়ে আওয়ামী লীগকে হটানো যাবে না বলে আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তখনই এই 'রগ কাটা', 'কল্লাকাটা' পার্টিকে সহোদর বানিয়ে একই মঞ্চে এনে বিনেসূতোয় গাঁথা মালার মতো একে অপরের সঙ্গে সুশোভিত হতে থাকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গোলাম আযমের গা থেকে যে সুগন্ধি বেরুতে থাকে মুখে রুমাল গুঁজেও বেগম খালেদা জিয়া তা ঠেকাতে পারেননি। গোলাম আযমের আপাদমস্তক জুড়ে যে কলঙ্কের ছাপ লেগে রয়েছে জাতির সামনে তা জ্বলজ্বল করছে। জঘন্য এই বিকৃত চেহারা লুকানো কৌশল হিসাবেই গোলাম আযমের পদত্যাগ নাটক। আসলে নেপথ্যে গোলাম আযমই জামাতের নেতা, প্রভু। এই সত্যটি জনগণের কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

গোলাম আযম যতই পদত্যাগ করুক তাতে তার কৃতকর্মের পাপস্খলন হওয়ার নয়। সে ক্ষমতার অযোগ্য, তার কু-কর্মের জন্য তাকে জনতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবেই। আজ আমাদের মাঝে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম আর বেঁচে নেই। এই জননী সাহসিকা গোটা জাতিকে উজ্জীবিত করে গেছেন ঘাতক গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তারই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে গোলাম আযমের

বিচার। জনতার আদালতে তাকে প্রকাশ্যে এবং ফাঁসিতে লটকিয়ে হত্যার রায় দেয়া হয়েছে। গণআদালতের সেই রায় কার্যকর করার দাবির সমর্থনে যখন তিনি দেশব্যাপী তীব্র গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন তখন এই গণরায়কে শ্রদ্ধা করার পরিবর্তে খালেদা জিয়ার সরকার উল্টো শহীদ জননীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রুজু করে। এই রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা কাঁধে নিয়েই শহীদ জননীকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে খালেদা জিয়ার সরকার যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন তার সঠিক জবাবও জনগণ দিয়ে দিয়েছে ১৯৯৬-এর ১২ জুনে। আবারও জনতা প্রমাণ করেছে জনগণই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আশার কথা, কুয়েত থেকে দেশে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন, যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচার করা হবে। জাতি আজ সেই দিনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে- যেদিন তার দেহ ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলবে।

আমাদের রাজনীতিতে কুড়াল ও গামছা তত্ত্ব

১৯৯৬ সাল। ১৫ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। চট্টগ্রাম থেকে বাসে চড়ে সন্ধ্যায় টিকাটুলির মোড়ে নামলাম। এরপর রিকশায় পুরানা পল্টনে বাসস অফিসের দিকে রওনা হই। দৈনিক বাংলার মোড়ে একটি নির্বাচনী প্রচারণার তেলেসমাতি দেখে রিকশা স্লো করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাক্সে সুন্দরভাবে রাখা বঙ্গবন্ধুর বড় একটি পোট্রেট। বৈদ্যুতিক কারুকার্যের সাহায্যে এমনভাবে তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যে, চরকার ঘূর্ণির মতো লাল, নীল, হলুদ, বেগুণি সবুজ প্রভৃতি রং এসে রংধনুর মতো বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠকে স্পর্শ করছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কিছুটা ভ্রমের কারণে দৃশ্যটি প্রথমে আমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়। মুহূর্তেই আমি আঁতকে উঠি। লক্ষ করলাম, বৈদ্যুতিক তেলেসমাতি এমনিভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যে, প্রতিটি রং বদলানোর পালায় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠকে শুধু রঙিন ছায়াই স্পর্শ করে যাচ্ছেন, একই সাথে একটি কুড়াল এসে এমন নির্দয়ভাবে বিম্বিত হচ্ছে যাতে, মনে হচ্ছে কোন সর্বনাশা ঘাতকচক্র অনবরত বঙ্গবন্ধুকে কুপিয়ে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। মাথা জোড়া লাগছে এবং আবার তা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এটা চলছে পৈশাচিক গতিতে অনবরত ঘড়ির কাঁটার দোলার মতো।

একটু মনোযোগ দেয়ার পরই আমার কাছে গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো। এই রং-বেরঙের বৈদ্যুতিক তেলেসমাতিটি আসলে ফ্রিডম পার্টির নির্বাচনী প্রচার কৌশল। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা পরবর্তীতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল পর্যন্ত গঠন করেছিল। সেই দলের নাম ছিল ফ্রিডম পার্টি এবং তাদের নির্বাচনী প্রতীক ছিল কুড়াল। তাদের মানব-সভ্যতা বিরোধী বর্বর কর্মকাণ্ড ও পৈশাচিক চরিত্রের সাথে কি বেপরোয়া মিল তাদের নির্বাচনী প্রতীকের। জাতির জনককে হত্যা করেও তাদের রক্ত পিপাসা মেটেনি। তাই সেই লোলুপ রক্ত পিপাসুরা বঙ্গবন্ধুর ছবি লাগিয়ে অনবরত গলায় কুড়াল মেরে কি পৈশাচিক উল্লাস উপভোগ করতো। দৈনিক

বাংলার মোড়ে ঝুলানো সেই নির্বাচনী প্রচার বাক্স দেখে তা অনুমান করা গিয়েছে। তবে দেশের আপামর জনগণের চিন্তা-চেতনার সাথে সামঞ্জস্যহীন ক্ষণিকের এই পৈশাচিক সুখানুভুতি, সেই কুড়াল প্রতীক, বঙ্গবন্ধুকে কুপিয়ে কুপিয়ে সুখ পাওয়ার সেই বৈদ্যুতিক বাক্স সকলের অগোচরে কখন কোথায় যে হারিয়ে গেছে তা কেউ লক্ষ রাখেনি। বর্তমান শতকের শেষ লগ্নে এসে সেই '৯৬-এর কুড়াল মার্কা টাইপের এক নির্বাচনী প্রতীকের তেলেসমাতি দেখলাম টাঙ্গাইল জেলার সখিপুর-বাসাইলের সংসদ উপ-নির্বাচনকে ঘিরে। তবে এবার কুড়াল নয়, এবারের খেলা গামছা নিয়ে। যদিও নির্বাচন কমিশন কোন প্রার্থীকে গামছা প্রতীক বরাদ্দ করেনি তবুও এবার বাসাইল-সখিপুর এলাকায় নির্বাচনের শেষক্ষণ পর্যন্ত (এমনকি এখনও) এই গামছা বহু আলোড়নের জন্ম দিয়েছে।

গামছা শাশ্বত বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের একটি বহুল ব্যবহৃত বস্ত্র। বলতে গেলে মহিলাদের আটপৌরে শাড়ির মতো মেহনতি পুরুষের জন্য গামছা একটি অবিচ্ছেদ্য বসন। কিন্তু আমাদের জনাব বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর-উত্তম গামছা প্রতীক বরাদ্দ চেয়ে আকারে-ইঙ্গিতে হাবেভাবে যে বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলেন তা গামছার উল্লিখিত অবয়বের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়- বরং উল্টোটাই। এই গামছারই আরেকটি রূপ আছে। সেটা চাঁদের কলঙ্কের মতো অন্ধকার রূপ, প্রলয়ঙ্করী রূপ, রণরঙ্গিনী রূপ। বস্তুত, জনাব সিদ্দিকী সাহেব গামছার সেই রূপকে উপজীব্য করে নির্বাচনযুদ্ধে বাজিমাত করার জন্য চতুরবণিকের মতো বাণিজ্যে নেমেছিলেন নিজ নির্বাচনী এলাকায়।

গামছার এই আদি ও হিংস্র রূপ কোন একসময় বিস্তীর্ণ বাংলার জনপদে সুপরিচিত ছিল। বিশ্বাস করি সভ্যতা-ভব্যতা ও আধুনিকতার স্পর্শ বিবর্জিত কোন কোন স্থানে এখনও গামছার সেই বন্য-হিংস্রতা বিদ্যমান রয়েছে।

এক সময় গ্রামেগঞ্জে, হাটেঘাটে এই গামছা ব্যবহার করা হতো মানুষকে অসম্মান, অপদস্থ ও বেইজ্জত করার জন্য। হঠাৎ করে কোন এক ব্যস্ত কোলাহল বাজারে হৈ-চৈ রৈ-রৈ পড়ে যেত। নিকটে গেলে দেখা যেত কোন এক গোবেচারা নিরীহ আদম সন্তানের গলায় গামছা বেঁধে টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। উপস্থিত সকলে পৈশাচিক উন্মত্ততায় সে দৃশ্য উপভোগ করে বন্যতৃপ্তি পেত। যদিও বলা হতো, ন্যায্য পাওনা আদায়ের জন্য গলায় গামছা দেয়া হয়েছে। আসলে তা ছিল চতুর ও ধুরন্ধরদের এক কূটকৌশল ও মিথ্যা প্রচারণামাত্র। কারণ এভাবে কখনও কোন দীন-দুঃখী, গরিব, কাঙাল তাদের ভিটামাটি ফেরত পাওয়ার জন্য কোন সুদখোর, জোতদার, মহাজন ও ধনিক বণিকের গলায় গামছা লাগিয়ে অপদস্থ করতে পেরেছে এমন নজির গ্রামবাংলায় নেই বরং মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা দেনার দায়ে এমনভাবে নাজেহাল হয়েছে অসংখ্য দারিদ্র্যপীড়িত বঞ্চিত মানুষ। কোন সময় জোতদার-মহাজনদের হাতে আবার কখনও কখনও তাদের লেলিয়ে দেয়া চামচা ও চেলা-চামুন্ডাদের দ্বারা।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এ কথা খোলাসা করে না বললেও নির্বাচনী প্রতীক নির্ধারণ ও তা বরাদ্দের জন্য পীড়াপীড়ি এবং ব্যবহারের ধারণ-ধরন দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, আসলে তিনি চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের গলায় গামছা লাগাতে। স্বপ্ন দেখেছিলেন, গলায় গামছা বেঁধে সখিপুর-বাসাইলের জনগণের সামনে দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবেন তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে। তাই প্রতীক হিসাবে গামছা না পেলেও নির্বাচনের শেষ লগ্নটি পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর সমর্থকরা মাথায় গামছা বেঁধে যুদ্ধংদেহী হাবভাব প্রদর্শন করেছেন।

শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার হবার পর তিনি কথায় কথায় ন্যায়নীতি, আদর্শ, বিবেক, সততা প্রভৃতি বিষয়ে আওয়ামী লীগকে উপদেশ দিয়ে চলেন। আজ যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন ন্যায়নীতির যাদুস্পর্শে উজ্জীবিত সিদ্দিকী সাহেব ভোটগ্রহণকালে নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে কোন্ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে দলবল সমেত লাঠিসোটা নিয়ে ঢুকে পড়লেন! কেবল সমাবেশ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়ে লাঠিসোটা দিয়ে নির্বাচন স্থগিত করার জন্য বল প্রয়োগও করেছেন। তিনি আইনের কথা বলতে গিয়ে মুখে ফুলঝুড়ি ফুটাবেন, তবে নিজে আইন মানবেন না। সালিশ মানি তবে তালগাছটা আমার। জনগণই সবচেয়ে বড় বিচারক। সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে তাই আমাদের মেধাবী সংবিধান প্রণেতাগণ সঠিকভাবেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। দু'দিন আগেই নিজ নির্বাচনী এলাকায় সমাপনী ভাষণ দিতে গিয়ে বীরদর্পে বিরোত্তম কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, দু'একদিনের মধ্যে এই পিঁড়ি আমি শেখ হাসিনার মাথায় ছুড়ে মারব। না, তিনি সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারলেন না। জনগণ সেই ঈপ্সিত সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। লাঠিসোটা, কুড়াল, গামছা সবময়ই ফলপ্রসূ হবে কিংবা কাঙ্ক্ষিত ফল বয়ে আনবে এমনটি নয়। আবেগের সাথে বুদ্ধিবৃত্তির স্পর্শ না থাকলে, বন্য অভিপ্রায়ের সাথে নীতিবোধ না থাকলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে না, টিকে থাকতে পারে না। ফ্রিডম পার্টির জজবা সৃষ্টিকারী সেই কুড়াল ও কুড়াল প্রদর্শনের দিনগুলো কখন কিভাবে জাতীয় জীবন থেকে গোপনে লাপাত্তা হয়ে গেছে কেউ খেয়াল করেনি, খেয়াল করার চেষ্টাও করেনি।

গামছার চটকদারীও অতি শিগগিরই কুড়ালের ভাগ্যবরণ করবে এতে সন্দেহ নেই। কুড়াল-গামছা তত্ত্ব রাজনীতিতে বেশি দিন চলতে পারে না। কারণ জনগণ এখন পুরোদমে সজাগ।

পাকিস্তান টিভি'র ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পাকিস্তানীরা এখনও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সম্মানের চোখে দেখতে শেখেনি। আমাদের অমূল্য স্বাধীনতার প্রতি সুযোগ পেলেই কটাক্ষ করা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা পাকিস্তানের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অতীতে অসংখ্যবার এমনটি ঘটেছে এবং সদ্য সমাপ্ত ত্রি-দেশীয় বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঢাকার মাঠে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পাকিস্তানীদের বচন-বাচনে তা আরও প্রকটরূপে ধরা পড়েছে।

গত রবিবার জাতীয় স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা কাপ টুর্নামেন্টের শেষ ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। অভূতপূর্ব আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ এই খেলার সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে পাকিস্তান টেলিভিশন (পিটিভি) রাতের খবরে, অন্তত ছ'বার খেলাটিকে "সিলভার জুবিলি কাপ" বলে উল্লেখ করেছে। একবারও বলা হয়নি স্বাধীনতা কাপ। অথচ কখনও কোথাও এ টুর্নামেন্টকে "সিলভার জুবিলি কাপ" বলে বলা হয়নি। পরিষ্কারভাবে উদ্যোক্তা, দেশী-বিদেশী সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া গত এক সপ্তাহ ধরে খেলাটিকে "স্বাধীনতা কাপ টুর্নামেন্ট" বলে প্রচার করেছে। পিটিভি'র লোকজন সম্ভবত চোখের মাথাও খেয়ে বসে থাকেনি। যখন পিটিভিতে বলা হচ্ছিল "সিলভার জুবিলি কাপ" তখন ঢাকার মাঠের যে ছবি দেখানো হচ্ছিল তার চতুর্দিকেই দৃশ্যমান "স্বাধীনতা কাপ" কথাটি। অতএব এটা করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। স্বভাবদোষে। ভাসুরের নাম নিতে মানা। তাই বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা' এই শব্দটি উচ্চারণ করতেই তাদের এই অনীহা ও গাত্রদাহ।

অবশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা উঠলেই পাকিস্তানীদের আঁতকে ওঠার কথা। লজ্জা শরমের বালাই কখনও ওদের ছিল না। 'মুসলমান-মুসলমান ভাই ভাই' বলে বাঙালিদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পাকিস্তান হাসিল করেই ওরা ভোল পাল্টিয়ে 'মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাই- তোমরা চাও আমরা খাই' বলে ২৪ বছর লুটের রাজত্ব কায়েম করেছিল। পরে যখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালিরা নিজেদের অধিকার

প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার তখন মানবসভ্যতার দুশমন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র নিরপরাধ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বীর বাঙালির কাছে পরাজিত ও আত্মসমর্পণ করে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই বাঙালিদের স্বাধীনতার কথা উঠলেই পাকিস্তানিরা আয়নায় তাদের বীভৎস ভূতের চিত্র দেখতে পায়। পিটিভি কেবল একাই নয়, তাদের প্রভুরাও বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাঙালিদের ওপর পরিচালিত গণহত্যা এবং বাংলাদেশের পাওনা বিপুল সম্পত্তির ভাগাভাগির কথা উঠলেই বেসামাল হয়ে পড়ে এবং নানারকম ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করতে কসুর করে না।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর বদান্যতায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে এলে তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানানো হয়। বাঙালি চিত্ত-বিত্তে এক ধনাঢ্য জাতি। পৃথিবীর তাবৎ পর্যটক ও ভ্রমণকারীরা এদেশে এসে এখানকার মানুষের আথিয়েতার ও হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার প্রশংসা করে গেছেন। তবে ব্যতিক্রম ছিল এই পাকিস্তানি বর্বর পশুরা। ভুট্টোকে তার '৭১-এর ঘৃণ্য ভূমিকা ক্ষমা করে দিয়ে বাংলাদেশের সকল স্তরের মানুষ তেজগাঁও এয়ারপোর্ট থেকে রাষ্ট্রীয় অতিথী ভবন পর্যন্ত দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়েছিল। অতিথিকে যোগ্য মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল। কিন্তু ফিরে যাবার সময় সাংবাদিকরা যখন বাংলাদেশের পাওনা সম্পদ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলেন তখন ভুট্টো সাহেব ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করে বলেছিলেন, 'সরি, চেক বইটা তো পকেটে করে নিয়ে আসিনি।' আর এই ভুট্টো তনয়া বেনজীর ভুট্টো ১৯৯৬ সালে চীনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনে যোগদান করতে গেলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যখন তাঁকে বাংলাদেশে ওই বর্বর বাহিনী কর্তৃক নারী ধর্ষণের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন, তখন অক্সফোর্ড পড়ুয়া ভুট্টো তনয়া না জানার ভান করে বলেছিলেন, "কই আমাদের সৈন্যরা ধর্ষণ-গণহত্যা চালিয়েছে বলে তো আমার জানা নেই।" ধিক্ শত ধিক্ এই বেনজীরকে।

অথচ বাংলাদেশ তার শাশ্বত ইতিহাস-ঐতিহ্যবোধ থেকে সবকিছু ভুলে গিয়ে পাকিস্তানের প্রতি সৎ প্রতিবেশীসূলভ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে। পাকিস্তানিদের কাছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ পাওনা থাকলেও বাংলাদেশ গত ২৪ বছর ধরে তাদের আড়াই লাখ নাগরিকের ভরণ-পোষণ করে যাচ্ছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মানবিক কারণে পাকিস্তানের এই অসহায় নাগরিকদের আশ্রয় দিচ্ছে বাংলাদেশ। যে পাকিস্তানের জন্য তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে এদেশের মানুষের বিরাগ ভাজন হয়েছে, সেই পাকিস্তানি শাসকরা বার বার তাদেরকে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও হরেক রকম ছলচাতুরী করে নিজের দেশের নাগরিকদের সাথে অনবরত প্রতারণা করে যাচ্ছে।

আশা করা গিয়েছিল এবার যখন নওয়াজ শরীফ ঢাকায় আসবেন তখন তার কাছ থেকে পাকিস্তানিদের ফেরত নেয়ার প্রশ্নে একটি সুনির্দিষ্ট ঘোষণা পাওয়া যাবে। এটিই ছিল

সকলের কাম্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিক সরকারি আলোচনায় বিষয়টির উল্লেখ করে নওয়াজ শরীফকে অনুরোধও করেছিলেন দুর্দশাগ্রস্ত আটকেপড়া পাকিস্ত ানীদের প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে। কিন্তু সুচতুর নওয়াজ শরীফ বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, উষ্ণ আতিথেয়তার পরশের পিছনে নওয়াজ শরীফ শেখ হাসিনার প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় সকল কূটনৈতিক শিষ্টাচার বিবর্জিত ভাষণ প্রদান করেছেন তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আমাদের মহা-মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তার কুটিল মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাকে অতিথী মনে করে আমাদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতি উত্তর দেয়া হয়নি সত্য, তবে নওয়াজ শরীফের এই বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রতি যে ধৃষ্টতা প্রকাশিত হয়েছে সময়ের বাঁকে এসে তার যুৎসই প্রতি উত্তর অবশ্যই দেয়া যাবে।

আবার ক্রিকেট খেলায় ফিরে আসি। বাঙালি অতিথিপরায়ণ জাতি। শাশ্বতকাল ধরে বাংলার মাটিতে এসে কত বিদেশী পর্যটক মেহমান এদেশের মানুষের উষ্ণতা আতিথেয়তায় ধন্য হয়ে কাব্যকাহিনী রচনা করে গেছেন। ঢাকার মাঠে পাকিস্তানি ক্রিকেটারগণ যে বিরল প্রাণঢালা সমর্থন-সম্মান পেয়েছিল, দর্শকরা যেভাবে তাদের পতাকা উচিয়ে উচ্চকণ্ঠে তাদের ক্রিকেটারদের প্রশংসা করেছিল তা দেখলে কেউ বলতে পারবে না- এই মাত্র সেদিন এই পাকিস্তানিরা এদেশের ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারংবার হাত উঁচিয়ে প্রাণভরে পাকিস্তানি ক্রিকেটের বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে প্রমাণ করেছেন- তিনি কত বড় ধৈর্যশীল জাতির প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি নিজে কত উঁচু মাপের রাষ্ট্রনায়ক। এমনকি শেখ হাসিনার পাকিস্ত ানিদের প্রতি এ ধরনের আবেগ-উল্লাস বিজড়িত সমর্থন কোন কোন শ্রেণীর দর্শকের কাছে সমালোচিত হয়েছিল। তারপরও তাঁরা স্বীকার করেছেন, অতিথি নওয়াজ শরীফকে পাশে বসিয়ে এতটুকু সৌজন্য সৌহার্দ্য দেখানো ছাড়া অন্য কোন করণীয় ছিল না শেখ হাসিনার।

কিন্তু পিটিভি ও পাকিস্তানিরা সমভাবে উদার ও শোভন হতে পারেনি। এতটুকু শোভনবোধ যদি তাদের থাকত, এতটুকু সভ্য-ভব্য জাতি যদি তারা হতো, তাহলে একথা হয়ত বলার প্রয়োজন হতো না।

তবে এখনও হয়তবা সময় আছে। পাকিস্তানিদের শোধরানোর সময়। বাংলাদেশের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা তাদের চাইতে হবে, যেমনটা চেয়েছেন জাপানের সম্রাট চীন ও কোরিয়ার কাছে। পাকিস্তানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের দাম ও পাকিস্তানি হানাদারদের রকমারি কু-কর্মের জরিমানা ছাড়াও বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে পাবে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ। বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে গেলে এ হিসাব কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে পাকিস্তানকে। এর কোন বিকল্প নেই।

পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের বর্তমান পাওনা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা

পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বদেশের মাটিতে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গিয়েছিলেন খুলনায়। সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বিদায় জানানোর সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন, "মুজিব ভাই, এক সঙ্গেইতো ছিলাম। দেশে ফিরে গিয়ে একটু চিন্তা করে দেখবেন কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা যায় কিনা" আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "কি সম্পর্ক রাখবেন ভুট্টো সাহেব। দেখে যান আপনার বর্বর বাহিনী কি নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে আমার মানুষের উপর। কি পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে আমার নিষ্পাপ মা-বোনেরা।"

বঙ্গবন্ধুর এই আক্ষেপের মাঝেই নিহিত ছিল বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সম্পর্কোন্নয়নবিষয়ক অন্তর্নিহিত ম্যাসেজটি। পাকিস্তান যদি গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালানোর দায় স্বীকার করে লাজলুণ্ঠিত-অবগুণ্ঠিত চিত্তে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইত বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাহলে হয়তো কোমল উদার হৃদয়ের অধিকারী বাঙালিরা মহত্ত্ব দিয়ে, উদারতা দিয়ে পাকিস্তানীদের ক্ষমা করতেও পারত এবং কেবল তখনই দু'দেশের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা যেত। শুধু মাফ চাওয়াই নয় তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের দাম আর পাকহানাদার বাহিনীর সৃষ্ট কু-কর্মের জরিমানা ছাড়াও পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। এসবের হিসাব-নিকাশ না করে, দেনা-পাওনা মিটিয়ে না দিয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন কি সম্ভব? অবশ্য মহল বিশেষের কথা আলাদা। পাকিস্তান বলতেই যারা অজ্ঞান তাদের কাছে এই মাফ চাওয়ার বিষয়টি একেবারেই গৌণ। মেরেছিস কলসীকানা তাই বলে কি প্রেম দেব না! এহেন মহলের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাগল মানুষের সম্পর্ক নেই। মিল নেই চিন্তা কিংবা চেতনার।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে পাক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর ঢাকা সফরের সময় দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার লক্ষে যে খসড়া দলিল প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে সম্পদ বন্টনের সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল। একই বছর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের যে পাওনা রয়েছে তারও একটি প্রাথমিক হিসাব প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের হিসাব মতে পাকিস্তান সরকারের চলতি ব্যয়, পরিকল্পিত ব্যয় ও প্রতিরক্ষা খাতে সম্পদের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ছিল ২৪৪৯.৯৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন, পাকিস্তান স্টিল মিলস কর্পোরেশন, পি.আই.এ., পি.এস.সি. প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সম্পদের উপর বাংলাদেশের পাওনা ছিল ২৪৬.৮৭ কোটি টাকা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ পাকিস্তানের কাছে অতিরিক্ত পাওনা দাবী করেছিল ৩২৪০ কোটি টাকা। এভাবে ১৯৭১ সালেই মোটামুটি পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনার পরিমাণ ছিল ৫৮৩২.৮২ কোটি টাকা। ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পাওনার পরিমাণ মুদ্রামাণের সূচক হিসাবে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটির উপর। আর '৭১ সালের অর্থকে যদি ১৫ শতাংশ হারে কমপাউন্ড সুদের অংকে হিসাব করা হয় তবে এই পাওনা আরও বহুগুণ বেড়ে যাবে। অবশ্য এর সাথে পাকিস্তান যে বিপুল পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানী সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল কিংবা স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী ঋণের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল তা হিসাব করা হয়নি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীদের পরিসংখ্যান হিসাবে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) জন্য রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ছিল সেনাবহিনীতে ১৫ শতাংশ, বেসামরিক প্রশাসনে ১২ শতাংশ, বৈদেশিক সাহায্য ৩০ শতাংশ ও কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ৩৬ শতাংশ পাবার অধিকারী।

পাকিস্তানীরা যে তাদের কৃতকর্মের জন্য মাফ চাবে না এবং বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদ ফেরত দেবে না তা খুবই স্পষ্ট। ১৯৭৪ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশ সফরে আসলে বিদায়ী প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকরা সম্পদ বন্টনের প্রশ্নটি উত্থাপন করলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, "সরি, চেক বইটি তো পকেটে করে নিয়ে আসিনি"। লারকানার নবাবজাদা ভুট্টোর এই উদ্ধতপূর্ণ আচরণের জন্য দায়ী আমরাই। আমাদের লালিত্য আথিয়েতা ও সৌজন্য বোধ। ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরকে কেন্দ্র করে সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন পাক হানাদার বাহিনীর নরহত্যার নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে বিমান বন্দরে ভুট্টোর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের। কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সকলকে ডেকে বারণ করলেন। ভুট্টো সাহেব আমাদের মেহমান। তাকে সামান্যতম বিব্রত করা সৌর্য-বীর্যশালী জাতি হিসাবে আমাদের মানায় না। বঙ্গবন্ধুর কথা

সকলে অবনত মস্তকে মেনে নিলেন। কিন্তু যে শিষ্টাচার ও ভব্যতার কথা চিন্তা করে বঙ্গবন্ধু এটা করলেন লারকানার নবাবজাদা করলেন ঠিক উল্টোটা। পাকিস্তানীদের এদেশীয় এজেন্টগণ আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবর্তনের দাবির মুখোশ পড়ে বিমান বন্দরে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে "চাঁন তারা পতাকার" এক উন্মাদনাপূর্ণ শো-ডাউন করে। বিষয়টি যখনই বাঙালিরা বুঝতে পারলেন তখন সে বিক্ষুব্ধ মানুষের হাত থেকে নিরাপদে ভুট্টো সাহেবকে বিমানে তুলে দিতে রক্ষী বাহিনী নামিয়ে রাস্তা পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কেবল জুলফিকার আলী করে ক্ষান্ত হয়নি। বাপকা বেটা সেপাইকা ঘোড়া- জুলফিকার তনয়া অক্সফোর্ড পড়ুয়া বেনজীর ভুট্টো আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে বেইজিং-এ গেলে বিশ্ব নারী সম্প্রদায় বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের জন্য পাকিস্তানী সেনাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবী জানালে বেনজীর বলেছিলেন, "তাই নাকি! কই কখনো তো শুনিনি পাকিস্তানী জোয়ানরা বাংলাদেশী মহিলাদের ধর্ষণ করেছে।"

'৪৭-এর জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি বাঙালিদের সাথে প্রতারণা ও ধোকাবাজি করেছিল। মুসলমান, মুসলমান ভাই ভাই বলে পাকিস্তান হাসিলের পর ২৩ বছর যাবৎ "মুসলমান, মুসলমান ভাই ভাই তোমরা চাও আমরা খাই" বলে বাঙালিদের শোষণ করেছিল। ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব রিয়াজ পিরচা বাংলাদেশে আসলে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল সম্পদ ভাগাভাগির প্রশ্ন বিবেচনার জন্য। প্রথম সভাটি হওয়ার কথা ছিল ইসলামাবাদে। কিন্তু ২২ বছরে কোন সরকার এ ব্যাপারে বসতে পারেনি। ভারতের কাছ থেকে গঙ্গার পানি ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য একটি মহল থেকে যে রকম হৈ চৈ হয়েছে, পাকিস্তানের কাছ থেকে আমাদের রক্ত পানি করা সম্পদ আদায়ের ব্যাপারে সেই বিশেষ মহলের মধ্যে তেমন কোন উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়নি।

পাকিস্তানের অপরাধ কেবল কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা না চাওয়া কিংবা সম্পদ ফেরত না দেয়ার মধ্যেই সীমিত নয়, যে মানব সভ্যতার জঘন্যতম অপরাধ করছে তাদের লক্ষ লক্ষ নাগরিকদের দেশে ফেরত না নিয়ে। আটকে পড়া পাকিস্তানী নাগরিকরা (বিহারী বলে পরিচিত) আর কত কাল মানবেতর জীবনযাপন করবে পর দেশের মাটিতে। বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশের পক্ষে আর কতকাল সম্ভব লক্ষ লক্ষ ভিনদেশী মানুষদের আহার জোটানো। ১৯৯৮ সালে যখন ত্রিদেশীয় বাণিজ্য সম্মেলনে নিয়াজ শরীফ ঢাকায় এসেছিলেন কথা ছিল নাকি পাকিস্তানীদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করে যাবেন। কিন্তু এমন একটি ঘটনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিরে আরও একটি অত্যুজ্জ্বল সাফল্যের পালক সংযোজন করতে পারে এহেন

ঈর্ষাকাতর হয়ে নেওয়াজ শরীফের 'কাছের লোকরা' সোনারগাঁও হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে গিয়ে শরীফকে বারণ করেছেন এমন কোন সিদ্ধান্ত এ মুহূর্তে না দেয়ার জন্য। বর্তমান প্রেক্ষিতে জাতির প্রত্যাশা পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক চোরাগলি থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ মানবতা ও কর্তব্যবোধ তাড়িত হয়ে নিজদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করবে। রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু মিত্র বলে কোন কথা নেই। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তো নয়ই। তিক্ত ও মর্মান্তিক অতীত স্মৃতি জীবন্ত থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের স্বার্থে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক শুধু স্বাভাবিক নয় উন্নত হওয়া দরকার। তবে পাকিস্তান বলতেই যাদের চোখে মারি ও কাশ্মিরের সৌন্দর্য ভেসে ওঠে অথবা আঙ্গুর আর আপেলের রসে জিহ্বা আলুপালু হয়ে উঠে তাদেরকে এই কঠিন সত্যটি বুঝতে হবে, যতদিন পাকিস্তানীরা তাদের কৃতকর্মের অপরাধ করজোরে স্বীকার করে অবনত মস্তকে বাংলাদেশের কাছে শর্তহীন ক্ষমা না চাইবে এবং বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক-মজুরের রক্তে গড়ে উঠা সম্পদের হিসাব পাই পাই বুঝিয়ে না দেবে ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না। পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষের কাছে কেবলই হয়ে থাকবে একাত্তরের ঘাতকের প্রতিচ্ছবি।

ব্যর্থ রাষ্ট্র, না ব্যর্থ সরকার

ভারতের জন্মগ্রহণকারী ইংরেজ কবি রুডিয়ার্ড কিপলিং লিখেছেন- 'Many Nations have come and pershed and left no traces. History gives very nakedly one single and simple reason for all cases. They failed because there people were not fit.' কবির এ চিরন্তন বাণী একটি প্রমাণিত সত্য। দেশ বা রাষ্ট্র কি ছার। সভ্যতা পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায় যখন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের এ ভূ-খণ্ডেই তো কত রকম সভ্যতার জন্ম হয়েছিল, যার অস্তিত্ব আজ কেবল ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ। আর্য, অনার্য, শক, হুন, দ্রাবিড় মঙ্গলীয়, পাঠান, মোগল কত ধরনের সভ্যতারই উত্তরসূরি আমরা; কিন্তু বর্তমানে সব সভ্যতা বিলীন হওয়ার পর আমরা ইংরেজদের সুদীর্ঘ পদানত হওয়ার পর পাঞ্জাবি, মাড়ওয়ারি শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত এক ক্ষুদ্র জনপদ ছাড়া অন্য কী পরিচয় আমাদের অবশিষ্ট আছে?

একশ্রেণীর রাজনীতিক বক্তৃতাবাজ ও বিশেষ খোলসের একশ্রেণীর সেমিনার শিল্পীদের মুখে প্রায়ই একটি বক্তব্য শোনা যায়, এ দেশ টিকে থাকবে। কেউ আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিতে পারবে না। আসলে এমন বক্তব্য কেবল আবেগপ্রবণ উচ্ছ্বাস। এর মধ্যে না আছে যুক্তি-তর্ক, না আছে বাস্তবতার বিন্দুমাত্র উপস্থিতি। আমরা কারা? এই সেদিনেও তো আমরা ছিলাম পাকিস্তানী, আমাদের দেশ ছিল প্রিয় পাকিস্তান। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মাত্র সে দিন বীরদর্পে ঘোষণা দিয়েছিলেন Pakistan has come to stay 'জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান, আজিমপুরের গোরস্তান'- এ স্লোগান দিয়ে আমরা প্রিয় দেশকে পাঞ্জাবি দখল মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বানিয়েছি। বাংলাদেশের লোকদের বলা হতো পূর্ব পাকিস্তানী। বর্তমানে বীরবাঙালি। অতএব আমাদের চোখের সামনেই প্রমাণিত হয়েছে রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের বাণীর সত্যতা।

যোগ্যতা হারিয়ে ফেললে জাতির বা দেশের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনায় পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শী ও অপরিণামদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জিন্নাহর দেশটি আজ মরহুম পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে।

রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের সতর্ক বাণীকে সামনে রেখে আজ আমাদের জাতীয় জীবনও এমনি একটি কঠিন কঠোর বাস্তবতা এসে উপস্থিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র বাংলাদেশে এমন একটি বক্তব্য নিয়ে এর পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। কেবল দেশেই নয়, বিদেশী প্রভাবশালী মিডিয়াতেও এ একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে। বিষয়টিকে হাল্কাভাবে কিংবা কেবল আবেগপ্রসূত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সীমারেখা টানার কোনো অবকাশ নেই। এর মধ্যে এ দেশের ১৪ কোটি মানুষের বাঁচা-মরার ও মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িত। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেও চেতনা ও লাখো মানুষের আত্মদানের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ইতিহাসের টিকে থাকার বিষয়টি। স্যার এডমন্ড বার্কের সে অগ্নিঝরা বক্তৃতা আমাদের চিত্তে আজো আন্দোলিত। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি গোটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে প্রকম্পিত করেছিলেন। একটি রাষ্ট্রের সব ধরনের উপাদানের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। স্যার এডমন্ড বার্কই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন চতুর্থ রাষ্ট্রের কথা। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি যথার্থভাবেই 'Fourth State' বলে অহঙ্কার অনুভব করেছিলেন। আজ একবিংশ শতকে এসে স্যার এডমন্ড বার্কের কথার সত্যতা আরো প্রকট হয়ে আরো জীবন্ত হয়ে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে। রাষ্ট্র কোনো একক ব্যবস্থার অধীনে কোনো ভূখণ্ড নয়। রাষ্ট্রের অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে সরকার কেবল একটি উপাদান। এছাড়াও রাষ্ট্রের রয়েছে বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, সুশীল সমাজ এবং সর্বোপরি এর সর্বশক্তিমান জনগণ। একটি রাষ্ট্রকে ব্যর্থ বলা যেতে পারে যখন এর সব উপাদান চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। আমাদের বেলায় কি তেমনটি ঘটেছে? শত নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের বিচার বিভাগ প্রায়ই ঐতিহাসিক রায় দেন, যা শুধু দেশেই নয় গোটা বিশ্বের সভ্য সমাজকে তাক লাগিয়ে দেয়। আমাদের জীবনের অনেক ঘোর অমানিশার অবসান হয়ে সুবহিসাদেকের রক্তিম সূর্যোদয় ঘটেছে এমন অনেক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে।

অতএব আমাদের বিচার বিভাগকে ব্যর্থ বলে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। বেশ শক্তিশালী, সাহসী ও কার্যকর একটি বিচার বিভাগ আমাদের দেশে রয়েছে। বিশেষ করে উচ্চ আদালত। আমাদের দেশে একটি সুশীল সমাজ রয়েছে। যে কোনো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সুশীলসমাজ খুবই সোচ্চার। তাদের

প্রতিবাদী ও সাহসী উচ্চারণ আমাদের দেশের এ সুশীল সমাজ সাধারণ মানুষকে কঠিন-কঠোর সময়ে উজ্জীবিত করে, অনুপ্রাণিত করে। সাহসের সঙ্গে বেঁচে থাকার নিরন্তর শক্তি যোগায়। আর আমাদের জনগণ! জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, এদেশ যেমন চৈত্রের দাবদাহে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তেমনই তেমন বর্ষার মৌসুমে হয়ে ওঠে পলিবিধৌত কোমল-সজীব মাটি। এদেশের মানুষের প্রকৃতিও তাই। এরা অতি সাধারণ নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু প্রয়োজনে হয়ে উঠে কঠোর-কঠিন অগ্নিগর্ভা। গ্রামে ডাকাত কিংবা শূকর পড়লে তেমন সব মিয়া, ভূঁইয়া, চৌকিদার, দফাদার, তরফদার, সৈয়দ, খন্দকার, লস্কর, জমাদার, মোল্লা, মাঝি একাকার হয়ে লাঠি-ঠ্যাংগা নিয়ে ডাকাত কিংবা শূকরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি রাষ্ট্রীয় জীবনে যখন স্বৈরাচার ও গণদুশমনদের উপদ্রব শুরু হয় তখন মানুষ নিজেদের সব ধরনের বিভেদ ও বৈরীতা ভুলে একসঙ্গে রাজপথে নেমে আসে এবং স্বৈরাচারের পতনের আগে আর তারা রাজপথে থেকে উঠে আসে না। মহান '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়াও এদেশের মানুষ অসংখ্য বার বিদেশী হানাদার, শোষক, তস্কর, লুটেরা ছাড়াও হরেক কিছিমের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে এবং বারবারই তারা সফল গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে গণদুশমনদের কবর রচনা করেছে। অতএব আমাদের রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বলার আগে এদেশের কোটি কোটি অকুতোভয় লড়াকু মানুষের কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। এদেশের সরকার কি ব্যর্থ? কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং বেশি সফলই তো মনে হয়। বাংলাদেশ উপর্যুপরি তিনবার দুর্নীতিতে প্রথম হয়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। একটি হতদরিদ্র ছোট্ট দেশে প্রায় শ'খানেক মন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয়েছে এ সরকার। রাষ্ট্রীয় ও সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠরাই নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছে এবং নিচ্ছে অত্যন্ত সফলভাবে। প্রশাসনে নগ্ন দলীয়করণ, অবৈধ পদোন্নতি, ন্যায্য লোকদের বঞ্চিত করা, সরকারের বিভিন্ন লেভেল থেকে সন্দেহভাজন ভিন্নমতাবলম্বীদের ঝেঁটিয়ে বিদায়, জাতীয় সংসদকে পুরোপুরি অকার্যকর করে দলীয় প্লাটফর্মে পরিণত করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করলে ফিনিশ করে দেয়া, সংবিধানকে ইচ্ছামতো দলিত-মথিত করা দেশে আইনের শাসনের বারটা বাজানো, হত্যা-নির্যাতন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত করা হচ্ছে। দেশের জঙ্গিবাদের উত্থানকে উৎসাহিত করা, বোমা-গ্রেনেড বিস্ফোরণসহ সব ধরনের সন্ত্রাসী ও নৈরাজ্যমূলক কর্মকান্ডকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা করা, গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধীদলের মিটিং-মিছিলে রক্তপাত ঘটানো। দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে বিদেশে পাচার, ঘুষের জন্য বিদেশ দূতাবাসে মন্ত্রণালয় থেকে লোক পাঠানোসহ বিভিন্ন কারণে যদি কাউকে

ব্যর্থতার দায়ভার বহন করতে হয় তবে তা অবশ্যই করতে হবে সরকার ও প্রশাসনকে, অবশ্য দেশ কিংবা জনগণকে নয়। অতএব ব্যর্থতার গ্লানি যদি কারো ললাটে চাপাতে হয় বা করো শিরে ব্যর্থতার পাগড়ি পরিয়ে দিতে হয় অথবা কারো গলায় বিনাসূতোয় গাঁথায় ব্যর্থতার মালা পরিয়ে দিতে হয় তবে তা দিতে হবে সরকারকে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত কলংকের ভাগিদার আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি কিংবা এর জনগণ হতে যাবে কেন? তবে কথা থেকেই যায়, ফুরোয় না। একটি কথা আছে- কান টানলে মাথা আসে। আমাদের সরকার কেবলই ব্যর্থ হয়। কেবলই দুর্নীতি ও অপশাসনে বিশ্ব শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখতে থাকে বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দেয়, জাতিকে নিয়ত বিপথে পরিচালিত করে, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ডুবিয়ে দিয়ে জাতিকে অপমৃত্যু ও আত্মহননের পথে ঠেলে দেয় কিংবা জাতির যা কিছু গর্বের,. যা কিছু ঐতিহ্যের সবকিছুকে ছলচাতুরি বা আত্মপ্রতারণার গিলাব দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ঢেকে দেয় তখন যে পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতার পাহাড় জমে ওঠে তাতে দেশ ও সরকার একাকার হয়ে যায়। এমন ক্ষেত্রে সরকার ও রাষ্ট্র একাত্মবোধক হয়ে ওঠে। তখন সরকার ব্যর্থ না রাষ্ট্র ব্যর্থ এমন সীমারেখা টানা দুরূহ-দুষ্কর হয়ে ওঠে। অতএব রাষ্ট্রকে ব্যর্থতার কলংক থেকে বাঁচাতে হলে সরকারকেও দুর্নীতি, অপশাসন, ব্যর্থতার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। আমাদের দেশ ব্যর্থ নয়- এ অহঙ্কার করতে হলে অবশ্যই সরকারকেও একটি সীমারেখা পর্যন্ত সফল হতে হবে। হতে হবে দুর্নীতিমুক্ত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী। তা না হলে রাষ্ট্র ব্যর্থ নয়, সরকার ব্যর্থ এমন কথা কেবল অর্থহীন বাগাড়ম্বর বলে বিবেচিত হবে। কলঙ্ককের কালিমা থেকে রাষ্ট্র কিংবা জাতিকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

ঝিরিনোভস্কির রাজনৈতিক তস্করবৃত্তি

সব রকমের শিষ্টাচার ও সভ্যতা-ভব্যতা আর একবার মুখথুবড়ে পড়ল ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লিতে। এ অঞ্চলের কোটি কোটি স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের অনুভূতির রাজ্যে হঠাৎ এক পাগলা মোষ ঢুকে পড়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল। এই অঘটন ও অপকর্মের হোতা কট্টর রুশ নেতা ভ্লাদিমির ঝিরিনোভস্কি। সম্প্রতি ভারত সফর করতে এসে এই ভদ্রলোক গোটা অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে গেলেন। হিটলারের প্রেতাত্মা উগ্র বর্ণবাদী ঝিরিনোভস্কি তার মনের খায়েশ ব্যক্ত করতে গিয়ে আহত করলেন অগণিত দেশপ্রেমিক মানুষকে, ছড়িয়ে দিলেন গোটা অঞ্চলে ঘৃণা আর ক্ষোভের দাবানল।

দিল্লিতে এসে 'দিল্লিকা লাড্ডু' খেতে খেতে তিনি ভারতকে নসিহত করলেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে কার্যকরভাবে দখল করে নিতে। ঝিরিনোভস্কির শিষ্টাচার ও বিবেকবর্জিত এহেন উক্তি বে-ফাঁসভাবে বেরিয়ে যাওয়া কোন তুচ্ছ মন্তব্য নয়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও কথায়-কাজে তিনি প্রমাণ করেছেন, এটা তার সুচিন্তিত অভিমত। রাজনৈতিক দর্শন। ভবিষ্যঃ পরিকল্পনা। ১৯৪৬ সালে বাল্টিক সাগরতীরে জন্মগ্রহণকারী রাশিয়ার এই তথাকথিত 'মহামানব' অবিভক্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে নাকি প্রীত হয়েছিলেন। জন্মের সাথে সাথেই তার মা-মাসিরা যখন ঝিরিনোভস্কির মুখে মধু ঢেলে দিচ্ছিলেন তখন সেই সদ্যজাত শিশুটি অখণ্ড ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অতএব আজ পরিণত বয়সে যখন তিনি মহাপ্রয়াণের আলামত দেখছেন তখনই তার সুপ্ত মনে লালিত বাসনা জেগে উঠল মৃত্যুর পূর্বে আবার অখণ্ড ভারত দেখে যাওয়ার।

একবিংশ শতকের স্বপ্নভেজা বিশ্বকে সামনে রেখে গোটা মানব জাতি যখন শান্তির ললিত বাণীর সন্ধানে নিরন্তর ব্যাপ্ত যুদ্ধ হানাহানি, রক্তলিপ্সা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, মারণাস্ত্র সব কিছুকে দাফন করে মানুষ যখন মানবতার ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে নতুন শতকের নতুন বিশ্বকে বরণ করার প্রত্যয় উন্মুখ তখন বিশ্বের অন্যতম জনপদ রুশ প্রজাতন্ত্রের বিরোধীদলীয়

নেতার সম্মানে অভিসিক্ত ঝিরিনোভস্কির মুখে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশকে দখল করে নেয়ার তস্করসুলভ প্ররোচণায় শুধু সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ নয় গোটা সভ্য বিশ্ব হতবাক। ইতোমধ্যেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে এহেন মস্তানসুলভ বক্তব্যের বিরুদ্ধে। ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে প্রায় সকলেই ঝিরিনোভস্কির কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঝিরিনোভস্কি পাগল কি-না চিকিৎসকরাই তা সঠিকভাবে বলতে পারবেন। হয়তো আসলেই তিনি মাতাল। তবে মাতাল হলেও তিনি যে তালে ঠিক অর্থাৎ বেতাল নন, তা তার কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তা পর্যালোচনা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ঝিরিনোভস্কি আসলে এক উঁচুমাপের ভণ্ড, উগ্র মস্তানি ও মতলববাজীর মধ্য দিয়ে সে তার আসল কাজটি হাসিল করতে সিদ্ধ হস্ত। একদা কট্টর কমিউনিস্ট ঝিরিনোভস্কি আজ লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অব রাশিয়া (এলডিপিআর)-র একচ্ছত্র নেতা। কমিউনিস্ট শাসনের প্রতি রাশিয়ার জনগণ যখন সাময়িকভাবে বীতশ্রদ্ধ তিনি তখন মানুষের মনের এই ক্ষোভকে পুঁজি করার লক্ষ্যে গণতন্ত্রের জামা-জুতা পরে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে যান। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে রুশ প্রজাতন্ত্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ 'ডুমা'য় তিনি একক বৃহত্তম দলের নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এমনকি সম্প্রতি নেয়া এক জনমত জরিপে দেখা গেছে, তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং অদূর ভবিষ্যতে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তার বিজয় প্রায় নিশ্চিত এবং রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। ঝিরিনোভস্কির এই অবস্থায় উঠে আসার পিছনে সবচেয়ে বেশি কাজ দিয়েছে তার মতলববাজ চরিত্র। আঞ্চলিকতা, বর্ণবাদ ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা আদায়ের কৌশল ঝিরিনোভস্কির ভালোভাবেই রপ্ত করা। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের পতনের অল্পক্ষণের মধ্যেই সাধারণ মানুষের যখন মোহভঙ্গ হলো, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধগতি, মুদ্রাস্ফীতি, কালোবাজারির অভিশাপ, ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি যখন রাশিয়ার জনজীবনকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে, মানুষ যখন চিন্তা করতে শুরু করেছে 'গণতন্ত্র খেয়ে পেট ভরবে না' তখনই ঝিরিনোভস্কি সদম্ভে ঘোষণা দিয়েছেন, সাবেক সোভিয়েত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশের নাম পাল্টিয়ে নতুন নাম রাখা হবে 'স্লাভল্যান্ড' এবং এর বিস্তৃতি হবে পূর্বে ব্লাডিভস্টক ও পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর। তার এই ঘোষণায় তন্ত্রমন্ত্রের মতো কাজ হয়েছে। হতাশাগ্রস্ত ও মোহভঙ্গ সোভিয়েত জনগণ তার পিছনে কাতারবন্দী হয়েছে।

মানুষের মন কেড়ে নেয়ার ফন্দি-ফিকির হিসাবে মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তার দম্ভোক্তি 'We will atom bombed Germany and through a blockade around Japan' রুশ প্রজাতন্ত্রের জনগণের মধ্যে টনিকের মতো কাজ করেছে। মানবতা বিবর্জিত ও ঘোরতর মুসলিম বিদ্বেষী এই নব্য

হিটলার আরও ঘোষণা করেছেন, "We will punish the Northerners (meaning Europeans) and crash Muslims Southerners" তার এই উক্তি সোভিয়েতের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মদদ যুগিয়েছে অন্য ধর্মের লোকদের উপর চড়াও হতে। সোভিয়েত নেতা ইয়েলৎসিন হলো ঝিরিনোভস্কির এক নম্বরের দুশমন। অথচ শুধুমাত্র মুসলিম বিদ্বেষী হওয়ার কারণে ঝিরিনোভস্কি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে গলাবাজি করে ইয়েলৎসিনের চেচনিয়া নীতিকে সমর্থন করেছেন।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গালাগালি করে ঝিরিনোভস্কি আসলে খুশি করতে চেয়েছেন ভারতকে। এই দুমুখো শাপ ভণ্ড রুশ নেতা ভারত সফরে আসার পূর্বে কোন এক সময় মন্তব্য করেছিলেন "My troops will wash their boots in the warm water of Indian ocean. এই লোকটির সন্দেহ ছিল তাঁর এই মন্তব্যের জন্য ভারত সফরে আসলে পালাম বিমান বন্দরে অবশ্যই কিছু দেশপ্রেমিক ভারতবাসী তাকে কালো পতাকা কিংবা পাদুকা সংবর্ধনা দিতে পারেন। এই সন্দেহ থেকেই ভোল পাল্টিয়ে ঝিরিনোভস্কি ঘোষণা দেন "We will have an alliance with India and United Germany and Neutralise China"

মতলববাজ ঝিরিনোভস্কি ভারতে এসে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করা ছাড়াও মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে ভারতকে খুশি করার চেষ্টা করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি সোভিয়েতের দোকানগুলোর র‍্যাক থেকে মুসলিম দেশ থেকে আমদানি করা বস্তাপচা ও তৃতীয় গ্রেডের খাবার সামগ্রী ও অন্যান্য পণ্য ছুড়ে ফেলে দিয়ে ভারতের ফার্স্টক্লাস পণ্যসামগ্রী দিয়ে রাশিয়ার বিপণিসমূহ সাজাতে চাই।"

তার এই মস্তানসুলভ বক্তব্যে যখন সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে প্রতিবাদের ঝড় বইছে সে সম্পর্কে সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ না করে ফ্যাসিস্ট ঝিরিনোভস্কি নয়াদিল্লি থেকে বিদায় নেয়ার প্রাক্কালে পুনরায় শাসিয়ে গেছেন, দরকার হলে কোন কোন রাষ্ট্র দখল করার জন্য তিনি ভারতের পক্ষে রুশ সৈন্য মার্চ করাবেন। কামান-গোলা পাঠিয়ে শায়েস্তা করবেন। আর নতুন একটি স্বপ্নসাধ ব্যক্ত করতেও ভোলেননি। তিনি চান, রুশ প্রজাতন্ত্র ও ভরতের সীমান্ত হবে পাশাপাশি। এবার শুধু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানই নয় ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সকল দেশের ভৌগোলিক সীমানা তিনি মুছে ফেলবেন। তবে এই মুছে ফেলার দুরূহ কাজটা কেবল ভারতকে করতে হবে না, তিনি নিজিও দু'চারটা দেশ দখল করে নেবেন কিনা তা খোলাসা করে বলেননি। তার বিদায়ী ভাষণে ঝিরনোভস্কি অবশ্য বাংলাদেশের 'মন খারাপ' করার কারণ না বোঝার কথা বলেছেন। তার ভাষায় "I can not understand why Bangladesh is upset." তার মতো একজন নব্য হিটলার না বুঝলেও অধুনালুপ্ত সোভিয়েট ও রুশ জনগণ ঠিকই বুঝবেন। তারা বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধু। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ

মুহূর্তে তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্ব ও জনগণ আমাদের পাশে ছিল। কেবলমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমপক্ষে চারবার সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের পক্ষে জাতিসংঘে ভেটো প্রয়োগ করেছিল। আর আজ সেই দেশের এক নেতা ত্রিশ লাখ লোকের রক্তভেজা আমাদের স্বাধীনতা "Artificial Entity" বলে কটাক্ষ করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। আমাদের কাছে না দিলেও রুশ প্রজাতন্ত্রের জনগণের কাছে এর কৈফিয়ত দিতে হবে ঝিরিনোভস্কিকে।

ঝিরিনোভস্কি কী বলেছেন তা নিয়ে ভারতের মাথাব্যথার কারণ নেই। তিনি ভারতে অতিথি হিসাবে বেড়াতে এসেছেন। তার মুখে কুলুপ লাগানোর দায়িত্ব ভারতের নয়। তবে এই ব্যক্তিটি যা কিছু বলেছেন সবই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে। ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সাথে ভারতের এক গভীর আবেগময় সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে যদি কেউ তামাশা করতে চায়, যদি কেউ কটাক্ষ করতে চায়, তাও আবার ভারতের মাটিতে বসে তবে ভারত ও তার জনগণ একে সহজভাবে নিতে পারে না। ঝিরিনোভস্কির বক্তব্য তার নিজস্ব। এর পুরো দায়দায়িত্ব তারই। তবুও ভারতকে অবশ্যই বলতে হবে, এর সাথে তার কোন সংস্রব নেই। এ জাতীয় কটূক্তি ভারতের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত। ঝিরিনোভস্কির বক্তব্যে ভারত ক্ষুব্ধ এবং ভারতকে আরও নিশ্চিত করতে হবে ভবিষ্যতে আর কেউ তার পবিত্র মাটিতে পা রেখে এ ধরনের বল্গাহীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতি করতে পারবে না। ভারতকে সম্প্রসারণবাদী হবার পরামর্শ দিয়ে আসলে ঝিরিনোভস্কি ভারতকে ছোট করতে চাইছেন। বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন। ভারতের অভ্যন্তরে একশ্রেণীর উগ্র জনগোষ্ঠী ঝিরিনোভস্কির বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে নাচানাচি শুরু করে এই সত্যটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছে।

নো জাজমেন্টস অ্যাকসেপ্টেবল, নো জাজেস সেফ

নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে গেল সুপ্রিম কোর্টে। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে সংঘটিত ঘটনাটি দুঃখজনক, নিন্দনীয় ও অপ্রত্যাশিত। প্রধান উপদেষ্টার বৈধতা চ্যালেঞ্জের রিটকে কেন্দ্র করে এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কোন কিছুই বাদ যায় নাই। সংঘর্ষ, ধাওয়া, পাল্টা-ধাওয়া, ভাংচুর এমনকি অগ্নি সংযোগ পর্যন্ত।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দল ও সমমনা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে এই রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। বিচারপতি আওলাদ আলী ও বিচারপতি মাঈনুল ইসলাম চৌধুরী সমন্বয়ে ঘটিত বেঞ্চে এই রিটের শুনানি হয়েছে। একই সাথে অন্য দুইটি রিট পিটিশনও একই বেঞ্চে শুনানি হয়।

মোট তিন দিন বিভিন্ন পর্যায়ে আইনি প্রক্রিয়া ও শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার এই রিট মামলার রায় প্রদানের দিন ধার্য করা হয়। সকালের উভয় পক্ষের বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক শোনার শেষে হাইকোর্ট বেঞ্চের মাননীয় বিচারকদ্বয় দুপুর দু'টায় আদেশ দেবেন বলে ঘোষণা দেন। তখন কিন্তু রিট আন্দোলনের পক্ষে আইনজীবীগণ বিশেষ করে ডক্টর কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম ও ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ সকালের সেসনেই আদেশ ঘোষণার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কারণ তারা ইতোমধ্যেই কোর্ট প্রাঙ্গণে কিছু ষড়যন্ত্রের নমুনা দেখতে পান। কিন্তু বেঞ্চের বিচারকদ্বয়ের অভয়বাণীতে তারা আশ্বস্ত হন।

ঠিক দুপুর দু'টা বাজলে যথারীতি কোর্ট বসেন। বিচারকদ্বয় রিট মামলার আদেশ প্রদানে উদ্যত হন। ঠিক এই সময় এটর্নি জেনারেল তার পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে বিচারকদের কাছে হস্তান্তর করেন। কানায় কানায় পূর্ণ কোর্ট রুমের সকলেই হতচকিত হয়ে যান। এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি কোর্ট রুমে বিরাজ করে। তারপর শঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো। বিচারকগণ জানালেন মহামান্য প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে. আর. মোদাচ্ছির, 'এই দরখাস্তটির আর শুনানি হবে না' বলে আদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়

সাথে সাথে বিচারপতি আওলাদ আলী ও বিচারপতি মাঈনুল ইসলাম চৌধুরী সমন্বয়ে হাইকোর্টের বেঞ্চটি ভেঙে দেন। প্রধান বিচারপতির এই কর্মকাণ্ডে 'বিনা মেঘে বজ্রপাতের' মতো গোটা কোর্ট রুমের সকলকে তড়িতাহত করল। মানুষের রুদ্ররোষ মুহূর্তেই গোটা কোর্ট প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে পড়ল অগ্নিশিখার মতো।

এই অতীব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও রাজনৈতিক স্পর্শকাতর রিট মামলাটির দিকে পক্ষে-বিপক্ষের চৌদ্দ কোটি মানুষ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় তাকিয়ে ছিল। এই পিটিশনের রায়ের উপর দেশ ও জাতির অনেক কিছু জড়িত ছিলো। কিন্তু প্রধান বিচারপতি এই কাণ্ডটি করতে গেলেন কেন? গুরুতর অভিযোগ উঠেছে রিট পিটিশনের শুনানির এই পর্যায়ে প্রধান বিচারপতি এই ধরনের নির্দেশ প্রদান সুপ্রিমকোর্টের ইতিহাসে অদৃশ্যপূর্ব। অভিযোগ উঠেছে তিনি সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন। আরো গুরুতর অভিযোগ প্রধান বিচারপতিকে দিয়ে এমন নির্দেশ জারী করা হয়েছে। এটর্নি জেনারেল যদি মনে করতেন এই গুরুত্বপূর্ণ রিট পিটিশনটি আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানি হওয়া উচিত তবে তিনি তো শুরুতেই তেমন পিটিশন দায়ের করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি যথারীতি রিট পিটিশনের হিয়ারিং-এ অংশ নিয়েছেন এবং রায় প্রদানের মুহূর্তে যখন টের পেলেন রায় আবেদনকারীদের পক্ষে যেতে পারে তখন তিনি দৌড়ে গিয়ে প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে একটি কাগজ লিখে আনলেন। এমন কাজটি নিম্ন আদালতে এক শ্রেণীর টাউট-টন্নীরা করে থাকেন। সঠিক বিচার পাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই এদের খপ্পরে পড়ে বিচারপ্রার্থী মানুষ এক বুক হতাশা ও মর্মযাতনা নিয়ে কোর্ট থেকে ঘরে ফিরে যান। কিন্তু দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পবিত্র আঙিনায় এ ধরনের প্রাকটিস জাতিকে কোথায় নিয়ে যাবে? আমরা শুনেছি নিম্ন আদালতের কোন কোন সাব জাজ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটগণ সদাসর্বদা ডিসি সাহেবের পরামর্শ কিংবা ডিকটেশন অনুযায়ী মামলায় রায় প্রদান করে থাকেন। কিন্তু এমন একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিম্ন আদালতের কোন বিচারকও এহেন প্রহসন করতে পারতেন কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সুপ্রিমকোর্টে প্রাঙ্গণ যখন বাতাস বিষাক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তখন থেকেই তৎপর ছিলেন সদ্য বিদায়ী সরকারের কয়েকজন আইনজীবী ও প্রাক্তন মন্ত্রী। আইনজীবীদের অভিযোগ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত অপ্রত্যাশিত ও অশ্রুতপূর্ব নির্দেশনামা জারীর পিছনে তাদের কারো কারো কালো হাতও সক্রিয় ছিল।

পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে যখন গণআন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতেছিল তখন মাঝে মধ্যে লড়াকু জনতা ২/১টি ইপিআরটিসির বাসে আগুন লাগিয়ে দিত। শ্রদ্ধেয় মানিক মিয়া সম্পাদিত ইত্তেফাক পত্রিকায় সেই ছবি ছাপাতে গিয়ে ক্যাপশনে লিখতো "জনতার রুদ্ররোষে ভস্মীভূত ইপিআরটিসির বাস"। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ জুড়ে তেমনিভাবে জনতার রুদ্ররোষের ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটে গেল। ভাংচুর,

জ্বালাও পোড়াও। সবকিছুই ছিল নিন্দনীয়। মানুষের আবেগ থাকাই স্বাভাবিক। তবে সুপ্রিম কোর্টের আঙিনায় সকলেই বুদ্ধিতাড়িত না হয়ে আবেগতাড়িত হবেন এটা জাতির কাছে কাম্যও নয়, জাতির জন্য মঙ্গলজনকও নয়। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন কেন প্রধান বিচারপতি। তিনি অবশ্যই জানতেন এই নজিরবিহীন নির্দেশটি কি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাই তিনি নির্দেশ দিয়ে অফিসে থাকেননি। অফিস ছুটির নির্ধারিত সময়ের বহুপূর্বেই তিনি চেম্বার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

বিচারকগণ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি (Representatives of God on earth). বিচারকদের চোখ দিয়ে সৃষ্টিকর্তা পৃথিবী দেখেন। বিচারকদের হাত ধরে আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে আসেন। বিচারকগণ তাদের মহান আসনে অভিষিক্ত হওয়ার মহেন্দ্রক্ষণে তাদেরকে দৃঢ়চিত্তে যে শপথ বাক্য পাঠ করতে হয় তার মর্যাদা রক্ষার তাগিদেই বিচারকদের থাকতে হয় ভয়ভীতিহীন ও দৃঢ়চিত্ত মন নিয়ে।

এখন প্রশ্ন যে রিট পিটিশনের ফলাফল জানতে দেশের চৌদ্দ কোটি মানুষ আকুল হয়ে বসেছিল সেই রিট পিটিশনের শুনানি আর হবে না বলে কেন, কাদের স্বার্থে এবং কাদের প্ররোচনায় নির্দেশ দিলেন। এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে নিথর নিস্পন্দ স্থবিরতা প্রদর্শন করে আসছে বছরের ওপর বছর। আমরা দেখেছি অনেক ঝঞ্ঝাময় পথ অতিক্রম করে বিচারপতি গোলাম রসুল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন। তবে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রতিটি মৃত্যুদণ্ডই হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। অথচ দেখলাম এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে পরপর পাঁচটি হাইকোর্ট বেঞ্চ বিব্রত বোধ করেছে। ৬-৭ বছর পেরিয়ে গেল আজ পর্যন্ত এই মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য খুনি চক্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারল না মহামান্য হাইকোর্ট। অথচ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রিট মামলায় শুনানি শেষে রায় প্রদানের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মহামান্য প্রধান বিচারপতি এক অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব নির্দেশ দিয়ে বসলেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে সংঘটিত ভয়াবহ বর্ণ দাঙ্গার কথা। ওই দাঙ্গায় সভ্যতার কাটা থমকে দাঁড়ায়- মুখথুবড়ে পড়ে মানব সভ্যতার। আর এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সূত্রপাত আমেরিকার ফেডারেল কোর্টের এক রায়কে কেন্দ্র করে। ওই ঐতিহাসিক রায় দেয়া হয়েছিল জেমস্ মেরেডিথ-এর পক্ষে ও মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বর্ণবাদী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সংঘর্ষ এমন ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে যে, পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে টেলিভিশনের মাধ্যমে গোটা জাতির কাছে

আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে শান্ত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাতে হয়েছিল। ঐ টিভি ভাষণে কেনেডি বলেছিলেন, 'Observance of the Law is the eternal safeguard of liberty and defence of the law is the surest road to tyranny.' আদালত ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আকুল আবেদন রেখে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "If this country should ever reach the point where any man or group of man by force or threat of force could long defy the commands of the court then no laws would stand free from doubts, no judges would be sure of his writ and no citizen would be safe from his neighbours. আইন আদালততো মানুষের জন্যই। মানুষের ভালমন্দ দেখাশুনার জন্য আইনের মঙ্গলের জন্য কিংবা আদালতের সম্মান রক্ষার জন্য মানুষ নয়। আমাদের দেশের পবিত্র সংবিধানেও এই পরম সত্যটি স্বীকৃত। জনগণ সার্বভৌম। জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক। আইন প্রণয়ন হোক কিংবা বিচার ব্যবস্থা হোক এর অন্তর্নিহিত মূল সুরটি হলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

আবার কেনেডির কথায় চলে আসি। তিনি বলেছিলেন, For the most effective means of upholding the law is not the state police man or the marshals nor the national guard. It is you, The People. It lies in your courage to accept those laws with which you disagree as well as those which you agree. এখানে আইন ও বিচারের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের উপর জোড় দেওয়া হয়েছে। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আইন আদালতের উপর জনগণের আস্থা থাকবে না। তেমন আইন আদালতে টিকতে পারে না। এই ধ্রুব সত্যটি অন্তত বাংলাদেশের মানুষের আইনের বই পড়ে শিখতে হবে না। ইতিহাস থেকেই শিক্ষণীয়। পাকিস্তানীরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে দায়ের করেছিল আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা। আদালত বসেছিল আব্দুল গণি রোডস্থ চামেলী হাউসে। জনগণ সেই ভবনটি পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সেই মামলার পাকিস্তানী বিচারক এস. রহমান দৌড়ে পালিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিল। এভাবেই যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এসে জনগণের আদালতই সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। জনগণের রায়ই সর্বোচ্চ রায়। অন্যদিকে Any judgement which is not consistant to the hopes and aspiration of the people is not acceptable and the judge himself is not safe. কোন রায় ঘোষণার কিংবা নির্দেশ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিচারপতি এই অমোঘ সত্যটি মনে রাখা দরকার। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে.আর. মোদাচ্ছিরের বেলাও একই কথা প্রযোজ্য।

বিএনপি-জামায়াত জোট :
তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বেড়েছে সে

তেলে আর জলে মেশে না। এটা প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তবুও অনেক সময় তেলে-জলে মেশানো হয়। কিন্তু ফল হয় উল্টো। ক্ষেত্রবিশেষে ঘটে চরম বিপর্যয়। আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঠিক তেমনি বিপর্যয়কর ঘটনার জন্ম হয়েছে। প্রকৃতির আরো একটি স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম রয়েছে। তাহলো রোগ সংক্রামক স্বাস্থ্য সংক্রামক নহে। এক হাজারটা স্বাস্থ্যবান লোকের মধ্যে একজন রোগীকে এনে দাঁড় করালে সে কখনো সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু একজন ছোঁয়াছে রোগীর কাছে এক হাজার লোক ছাড়া হলে প্রত্যেকেই সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একাত্তরের ঘাতক, খুনি চক্রের সঙ্গে সখ্য করতে গিয়ে এই নর্মম সত্যটি আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে 'মুক্তিযোদ্ধা' জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি।

এখানে চরম সত্য কথাটা বলে রাখা ভালো। বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের সখ্যটা কেবল ২০০১ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেনি। জিয়াউর রহমান সাহেব জামায়াতের প্রধান গোলাম আজমকে (যার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল হানাদারদের সহায়তা করার অপরাধে) বিদেশ থেকে অমন্ত্রণ করে বাংলাদেশে এনে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছিলেন। তিনি এক অজানা কারণে হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আর পরাজিত রাজাকার-আলবদররা একত্রে ওঠাবসা করতে পারে না। কিন্তু স্বার্থ বড় নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন। কেবল পঁচাত্তর পরবর্তী দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার গরজেই এই অদ্ভুত ও আত্মঘাতী সহমর্মিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছিল। এমনিভাবে ক্ষমতা দখল ও ভোগবিলাসের যে লিপ্সা সেদিন বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাজিল হয়েছিল তারই এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফোকড় দিয়ে যুদ্ধাপরাধী জামায়াত চক্র 'মুক্তিযোদ্ধা' জিয়াউর রহমানের সাফারির ভাঁজে আশ্রয় নিয়েছিল। আরব দেশে নাকি তাঁবু দেখলে উট এসে তার নাকটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে

দেয়। তাঁবুর মালিক যদি বুদ্ধিমান হন, অভিজ্ঞ হন তবে দূর দূর করে উটটিকে তাড়িয়ে দেন। কিন্তু তাঁবুর মালিক যদি একটু বেকুব ধরনের হন এবং দয়াদ্র হৃদয়ের অধিকারী হন তাহলে সে ভাবে আহারে! এখনই তো বালিয়াড়ি এসে উটটিকে বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে। ওর নাকটা থাকে না তাঁবুর মধ্যে সযত্নে, নিরাপদে। সামান্য নাকটা আর কতটুকু জায়গা দখল করবে? কিন্তু না, বাস্তাব বড় কঠিন ও রূঢ়। যেই তাকে তাঁবুর মধ্যে নাকটি রাখার সুযোগ দেওয়া হলো আমনি উটটি এক 'গোতালী' দিয়ে গোটা দেহটি তাঁবুর দধ্যে গুটিয়ে দেয়। এমনকি তাঁবুর মালিক কোনো কোনো সময় সিটকে পড়ে নিজের নিরাপদ আস্তানা থেকে।

জিয়াউর রহমানের 'রাজনৈতিক বাণিজ্যের' পথ ধরে একদিন যে জামায়াত বিএনপির মাঝে নাকটি প্রবেশ করিয়েছিল আজ এক ধাক্কায় গোটা শরীরটা ঢুকিয়ে দিয়ে উটের আশ্রয়দাতা তাঁবুর মালিকের মতো বিএনপিওয়ালাদের নিরাপদ অবস্থানকেই দুঃসহ বেদনাবিধুর ও অনিশ্চিত করে তুলছে।

বিএনপির কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটির প্রভাবশালী সদস্য বর্ষীয়ান রাজনীতিক নেতা কেএম ওবায়দুর রহমান কি সাংঘাতিক অবস্থায় নিপতিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হন যে, বর্তমান জামায়াত চক্র যে হত্যাযজ্ঞ চালচ্ছে তা কেবল '৭১ সালের বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে তুলনা করা চলে। বিচারক, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ওবায়দুর রহমান অনতিবিলম্বে জোটের শরিক জামায়াতকে সরকার থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে এককভাবে নির্বাচন করার পরামর্শ দিয়ে বলেন যে, ২০০১ সালেও তাই করা উচিত ছিল। বাংলাভাইয়ের নেতৃত্বে জাগ্রত মুসলিম জনতার ঘাতকদের নখরাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন রাজশাহীর বাঘমারার সাংসদ আবু হেনা নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন অসংখ্য করুণ মৃত্যুর সঙ্গে জামায়াত ও জেএমবির সংশ্লিষ্টিতা। তাই তিনি ব্যক্তিগত সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণাম জেনেও বিদ্রোহ করেছেন জামায়াতের বিরুদ্ধে এবং দেশে জঙ্গিবাদের একমাত্র হোতা বলে জামায়াতকে চিহ্নিত করেছেন। পরিণতিতে পুরস্কারের বদলে তার ললাটে জুটেছে তিরস্কার। দল থেকে বহিষ্কারকরা হয়েছে তাকে কেবল জামায়াতকে খুশি করার জন্য, বাগে রাখার জন্য।

আজ শুধু অলি-ওবায়েদ-হেনা সাহেবরাই নন, দলের অধিকাংশ মন্ত্রী, এমপি, কেন্দ্রীয় নেতা সোচ্চার হয়েছেন জামায়াতের বিরুদ্ধে। প্রকাশ্যেই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন একাত্তরের রাজকার-আলবদর চক্রের বিরুদ্ধে। সাংসদ আবু হেনা যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সন্ত্রাসী করে, মাস্তানি করে, গায়ের জোরে, ভয় দেখিয়ে আগামী নির্বাচনে পছন্দমতো সংখ্যক সিট আদায়ের লক্ষ্যে জামায়াত দেশব্যপী জঙ্গি কার্যকলাপ চালিয়ে বিএনপির নীতিনির্ধারকদের এই ম্যাসেজই পৌঁছে দিতে চাচ্ছেন যে, তাদের কথা না শুনলে বিএনপিকে ও জঙ্গিবাদের শিকার হতে হবে।

বিএনপিতে যারা মধ্যপন্থী বলে পরিচিত তারাও যে বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন তা নয়। কত দুঃখ ও বেদনায় পড়ে বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সাহেব টিভি চ্যানেলের সামনে বলতে বাধ্য হন যে, দেশ আজ বিপন্ন, গণতন্ত্র বিপন্ন, এমনকি সংবিধান ও বিপন্ন। ভূঁইয়া সাহেব ভালো করেই জানেন, তারা সরকার গঠন করেছেন যে শপথ বাক্য পাঠ করেন তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে সংবিধান সংরক্ষণ করার কথা। আজ যখন প্রকাশ্যেই বলেছেন সংবিধান বিপন্ন, তখন কি তারা ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার রাখেন? তারপরেও পরিস্থিতি এত ভয়াবহ যে, সত্য কথাটি মুখ ফসকে উচ্চারিত হয়ে যায়। মান্নান ভূঁইয়া-নোমান ভাইদের এই দুরবস্থা দেখে কেবলই মরমী লোক সঙ্গীতের কথা মনে হয়– 'ভাবিলে আর কী হবে গো, যা হবার তা হইয়া গেছে'।

রাজনীতিতে শেষ বলে কোনো কথা নেই। বিএনপির সামনে রাস্তা পরিষ্কার। জামায়াত চক্র এমন একটি অংকের হিসাব দাঁড় করিয়েছে যে, তারা সরে গেলে বিএনপি নির্বাচনে একেবারেই ধরাশায়ী হয়ে যাবে। আসলে এই অংক অনেক আগেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এলোমেলো হয়ে গেছে, ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জামায়াতের লাখ খানেক ভোট গেল কোথায়? দিনাজপুরের উপনির্বাচনে জামায়াত ধরাশায়ী হলো কেন? পটিয়ার নির্বাচনে জামায়াতের ভরাডুবির কারণ কি? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আজ বিএনপির মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত ও প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এক মত যে, বিএনপির জন্য বর্তমান জামায়াত একটি মস্ত বড় পলিটিক্যাল লায়াবিলিটি। যত তাড়াতাড়ি জামায়াতি ভূতকে ঘার থেকে নামানো যাবে বিএনপির জন্য ততই মঙ্গল। বিএনপিকে আজ গভীরভাবে বুঝতে হবে– 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বেড়েছে সে' যে বিষধর কাল সাপ তারা দুধ-কলা দিয়ে এতদিন পোষণ করেছে, তোষণ করেছে আজ সে উদ্ধত ফণা বিস্তার করে দাঁড়িয়েছে ছোবল দেওয়ার জন্য। একেবারে বিএনপির হৃদপিণ্ডের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে, কইলজার মধ্যে।

রাজাকারের ঔদ্ধত্য পদভরে কম্পিত বাংলাদেশে এবার বৈশাখ এসেছে বাঙালিত্বের অভ্রভেদী দাপট নিয়ে

এবার বাংলা নববর্ষের সূর্য উঠেছে অন্যভাবে। ১৪১৩ সালের আর্বিভাব ঘটেছে আমাদের জাতীয় জীবনে একেবারেই ভিন্নরূপে। রাতের আঁধার মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পহেলা বৈশাখে গোটা দেশ ভেসেছিল প্রাণের জোয়ারে। দুর্জয় প্রাণের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাঙালি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে নির্মল আনন্দ সাগরে ভেসে বেড়িয়েছে। রাজধানী ঢাকার পুরোটাই পরিণত হয়েছে মিছিলের নগরীতে। অস্তিত্বের টানে আর শেকড়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে লাখো জনতা। অন্তহীন মিছিল মিছিলে সয়লাব হয়ে গেছে গোটা শহর। একই দৃশ্য ছিল এবার বিশাল বাংলাজুড়ে। হাটখোলা-বটতলা সর্বত্রই আনন্দমুখর বীর বাঙালির দীপ্ত পদচারণায় বাঙময় হয়েছে, মুখরিত হয়েছে। এবারের জনতার উচ্ছ্বাস-আবেগ ও উন্মাদনা ছিল অভূতপূর্ব। পহেলা বৈশাখ ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবারের নববর্ষের চেতনা উজ্জীবিত করতে পেরেছে বাঙালিদের। সাধারণ, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সকল বাঙালিই পহেলা বৈশাখের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। অবশ্য এর কারণও ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

আমাদের প্রিয় চারণ কবি মুকুন্দ দাসের একটি অতি জনপ্রিয় মরমি গানের অন্তরাটি এখানে মনে পড়ে। 'মাগো, আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে/তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি/তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।' এই চরণ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি মাত্রই মন্ত্রমুগ্ধের মতো একাকার হয়ে যায়। চেতনায়-প্রেরণায় আঙ্গিকে-অবয়বে প্রতিটি বাঙালি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বাঙালিত্বের প্রচণ্ড দাপটে। মুকুন্দ দাসের গানের যে মূল সুরটি অনুরণিত হয়েছে, ঝংকৃত হয়েছে তার গানের প্রতিটি শব্দে, ছন্দে, ব্যঞ্জনায়-দ্যোতনায় তা হলো আমাদের শাশ্বত প্রতিবাদী চরিত্র। আঘাত না আসলে আমরা প্রত্যাঘাত করতে পারি না। প্রত্যয়ী ও প্রতিবাদী হতে পারি না। আমাদের জাতির সামনে শত্রু এসে দাঁড়ালেই আমরা বজ্রের মতো গর্জন করে উঠি। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি সামান্য আঘাত আসলেই আমরা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো, মত্তমাতঙ্গের মতো, হৃদশাবা বাঘিনীর মতো গর্জন করে উঠতে পারি। এটাই আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা। এটাই আমাদের ঐতিহ্যের অহঙ্কার। এই

অহংবোধের জন্য আমরা পৃথিবীর বুকে একমাত্র জাতি হিসেবে অত্যুজ্জ্বল সম্মানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে আছি। আমরাই সে বীরের জাতি যে জাতি মায়ের ভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ দিতে পেরেছে। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে বুক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু এতোটুকু মাথা নত হয়নি। আমাদের এই গৌরব গাঁথারই স্বীকৃতিস্বরূপ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্ত র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এই দিনে অন্তত বিশ্বের ১৮০টি দেশের মানুষ স্মরণ করছে আমাদের বাংলার সন্তানদের- যারা মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে মরে অমর হয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

পঞ্চাশের রক্তঝরা দশক পেরিয়ে আমরা যখন ষাটের দশক অতিক্রম করছিলাম তখনো আবার ভিন্ন কায়দায় আমাদের বাংলা ভাষা ও লালিত্য সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছিল। তথাকথিত পাকিস্তানী তাহজিব-তমুদ্দুনের নামে বাংলার আবহমান সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ করে দেয়ার সুকৌশল চক্রান্ত করেছিল পাকিস্তানী শাসক-শোষক ও তাদের পদলেহী এ দেশীয় কুলাঙ্গাররা। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিরোধিতার নামে তথা আপামর বাঙালিদের রাবীন্দ্রিক বলয় থেকে টেনেহিচঁড়ে বের করে ক্লেদাক্ত পাকিস্তানী উর্দু কালচারের গোলাম বানানোর এক দোর্দণ্ড প্রস্তুতি চলছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। স্বৈরাচারী আইয়ুবের কুলাঙ্গার পুত্র বলে খ্যাত গভর্নর মুনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক ও গবেষকদের ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন- কেন তারা নিজেরাই রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির অগ্রসৈনিক অধ্যাপক আব্দুল হাই মুনায়েম খানের মুখের ওপর বলেছিলেন, আমরা যদি সংগীত লিখি তা হবে হাই সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত নয়।

প্রকারান্তরে মুনায়েম খানদের ধন্যবাদ। আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত করেছিল বলেই সেদিন বাঙালিরা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পেরেছিল। ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল। সেদিনের সেই ঐক্যচেতনা শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা হয়ে বাঙালিদের এক দুরন্ত সাহসী, অপ্রতিরোধ্য ও লড়াকু জাতিতে পরিণত করেছিল এবং এই প্রতিরোধের আগুনে দগ্ধ পোড়খাওয়া জাতিকে সঙ্গে নিয়েই শেষ পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি গৌরবদীপ্ত স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন।

এবারের বাংলা নববর্ষ তেমনি একটি প্রতিবাদী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। যে ঘৃণিত বাঙালিবিরোধী চক্র একদিন সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারদের গুলি করে হত্যা করেছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধের পাঁয়তারা করেছিল, আমাদের শহীদ মিনার কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়েশি বটগাছটিকে উপড়ে ফেলেছিল, জয় বাংলা স্লোগান দেয়ার অপরাধে পাঁচ বছরের দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাথার খুলি সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে বাংলাদেশের পতাকা পুঁতে দিয়েছিল, যারা উঠানে শুকানো মায়ের শাড়ির

আঁচল আর পিতার জায়নামাজের উদার জমিন অপবিত্র করেছিল সেই ঘৃণিত শকুন ও তাদের প্রেতাত্মারা আজ রাষ্ট্রক্ষমতার ভাগীদার। সেই ঘৃণ্যচক্র আবারো বাঙালিদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলে হিংস্র ছোবল দিতে উদ্যত। ঠিক এমন এক মুহূর্তে বাংলা নববর্ষ ১৪১৩ আমাদের জাতীয় জীবনে সমাগত। এ কারণেই এবারের পহেলা বৈশাখের এই রুদ্রমূর্তি-প্রতিবাদী ঝড়ো হাওয়া। উগ্র মৌলবাদ, জঙ্গি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির নখরাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন জাতীয় জীবনে এবারের বৈশাখী আগমন তাই চন্ডালিকার মূর্তিতে। জাতীয় জীবনের এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ অত্যাসন্ন প্রত্যক্ষ করেই বাঙালিমাত্রই তাদের উগ্রমূর্তি নিয়ে প্রতিবাদী চেতনায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মঙ্গল শোভাযাত্রায়। তাদের কণ্ঠে ছিল অপশক্তি রোখার সুদীপ্ত শপথ আর পদভারে ছিল প্রকম্পিত মেদিনী। জাতীয় জীবনের এই আসন্ন ঝড়ো হাওয়ার সংকেত কিংবা এই দুর্যোগ সন্ধিক্ষণে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে কেউ কাউকেই সজাগ করে দিতে হয়নি। বাঙালি মানুষের এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, অন্তর্নিহিত শক্তি। তারা নিজেরাই উপলব্ধি করে নিয়েছে আসন্ন ঝড়ো হাওয়ার ইঙ্গিত এবং একই সঙ্গে স্থির করে নিয়েছে তাদের অগ্নিশপথের দীক্ষা।

অপরদিকে বাঙালি-বিরোধিরাও অসচেতন ছিল না, অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল না। তারাও টের পেয়েছিল বাঙালি মানসের এই সহজাত একাত্মবোধ হওয়ার ঘটনাটি। তাই কেবল আত্মরক্ষা নয়, পরিস্থিতি সামাল দিয়ে কীভাবে তাদের কুটিল স্বার্থ হাসিল করা যায় সে সম্পর্কে তাদের প্রস্তুতিও ছিল লক্ষণীয়। হঠাৎ করেই দেখা গেলো ইসলামপন্থীরা তাদের আদলে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের তোড়জোড় শুরু করলো। হামদ-নাতের মাধ্যমে তারা বরণ করে নিতে চাইল পয়েলা বৈশাখকে। এটা কোনো নতুন চালবাজি নয় কিংবা নতুন কোনো কৌশলও নয়। একেবারেই 'নতুন বোতলে পুরোনো মদ'। তাদের পিতা, প্রপিতারা এমনি করেই বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দখল ও বিনষ্ট করার তৎপরতা চালিয়েছিল ষাটের দশকের উত্তাল দিনগুলোতে। তারাও পাকিস্তানের তাহজিব-তমুদ্দুন ও তথাকথিত জাতীয় ঐক্য সংহতি রক্ষার খায়েস নিয়ে গঠন করেছিল ব্যুরো অব ন্যাশনাল রি-কনস্ট্রাকশন। কিন্তু বাঙালিত্বের প্রবল স্রোতে তারা ভেসে গেছে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। আজো যারা ধর্মীয় উন্মাদনা মধ্য দিয়ে বাঙালির চিরায়ত কৃষ্টি-সভ্যতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য দখলের পাঁয়তারা করছে তাদের বুঝতে হবে বাঙালিত্ব এক বিশাল শক্তির আধার। কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র করে নয়, বাঙালিত্বের বিশাল সমুদ্রে অবগাহন করতে হলে চাই মনেপ্রাণে বাঙালি হওয়া। ষড়যন্ত্র করে, 'পায়েন্দাবাদের' ভূত নামিয়ে উদাস কণ্ঠে উচ্চারিত হতে হবে 'আমার সোনার বাংলা– আমি তোমায় ভালোবাসি।' এই ভালোবাসার মধ্যে যাদের সামান্যতম খাদ থাকবে তারাই ছিটকে পড়বে বাঙালি মানসপট থেকে। ষড়যন্ত্র করে, পায়েন্দাবাদের বোরকা পরে বাঙালি হওয়া যাবে না, কিংবা বাঙালি হৃদয় দখল করে কারো কোনো খায়েস পূরণ করা যাবে না। বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করতে চান, ক্ষমতা দখল করতে চান তাদের উচিত হবে অতীতকে ভুলে, অতীতের অপকর্মের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে মনে প্রাণে বাঙালি হয়ে যাওয়া।